মানব সভ্যতার আদিকথা



History Book for Class VI written as per the new syllabus introduced under Circular No. Syll./78/8, dated 31. 7. 78, Syll./78/9, dated 2. 9. 78, Syll./78/12, dated 13. 10. 78, Syll./78/13, dated 13. 10. 78 from 1980 onwards. Board's Notification No. Syll./PN/1/79 dated 8. 1. 79. Recommended and approved by the West Bengal Board of Secondary Education, Vide T.B. No. VI/H/79/98, dated 5. 12. 79.

মানব সভ্যতার আদিকথা

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

ভাস্কর দাসগুপ্ত, এম. এ.,
অধ্যাপক, বর্ধমান রাজ কলেজ, ইতিহাস বিভাগ
ও
নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.,
অধ্যাপক, বর্ধমান বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ

সোমা বুক এজেন্সী
৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
সোমা বুক এজেন্সীর পক্ষে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
৪২/১, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী—শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়

ভারত সরকারের আনুকূল্যে প্রাপ্ত স্বল্পমূল্যের কাগজে মুদ্রিত।

প্রথম প্রকাশ—১৯৭৯
দ্বিতীয় প্রকাশ—১৯৮০
তৃতীয় প্রকাশ—১৯৮০ নভেম্বর

আর্থিক মূল্য—টাকা ৫ ২০ পয়সা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুধাতোষ বসু
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

১। আমরা ইতিহাস পড়ব কেন?

পৃথিবীতে আবির্ভাবের পরে হাজার হাজার বছর অতিক্রম করে মানুষ বর্তমান যুগে পৌঁছেছে। আজকের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে কত উন্নত। তারা গড়ে তুলেছে সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্র। কিন্তু একদিন তারা ছিল খুবই অসহায়। বনের পশুদের মত ঘুরে বেড়াত বনে-জঙ্গলে। কেমন করে মানুষ এত সভ্য হয়ে উঠল, কেমন করে নিজেদের আর পৃথিবীর রূপটাকেই পালটে দিল—তা জানার জন্য আমরা ইতিহাস পড়ব। আর এই ইতিহাস লেখার তথ্য যোগাড় করা হয়েছে পুরানো দিনের হাতিয়ার, গুহাচিত্র, লিপি, মুদ্রা, শহর ও নগরের ধ্বংসস্তূপ থেকে।

বিশাল পৃথিবী জুড়ে মানুষের বাস। আজকের মানুষ বুদ্ধিমান, শক্তিশালী, সভ্য। একদিন তারা ছিল খুবই অসহায়। বনের পশুদের মতই বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। ধীরে ধীরে তারা গড়ে তুলল সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্র। মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারতবর্ষ ও চীনে কয়েক হাজার বছর আগেই গড়ে উঠেছিল উন্নত সমাজ ও সভ্যতা।

কেমন করে মানুষ এত সভ্য হয়ে উঠল, কি করে নিজেদের আর পৃথিবীর রূপটাকেই পাল্টে দিল, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলার নতুন নতুন আবিষ্কার করল, সেটা জানতে তোমাদের নিশ্চয়ই ইচ্ছা হয়। প্রাচীন কালের মানুষ কেমন ছিল, তারা কি করত, কি ভাবত, কেমন করে তাদের জীবনে পরিবর্তন এল—এসব জানতে হলে আমাদের ইতিহাস পড়তে হবে। কেমন করে মানুষ আদিম অবস্থা থেকে বর্তমানের সুসভ্য মানুষে পরিণত হল, ইতিহাস পড়লে তা জানা যাবে। মানব সভ্যতার অগ্রগতির কাহিনী নিয়েই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

মানুষের জীবনের অতীতকে জানার জন্যই আমরা ইতিহাস পড়ব। অতীতকে জানা প্রয়োজন কেন? অতীতই সৃষ্টি করেছে বর্তমানকে, আবার বর্তমান সৃষ্টি করে ভাবীকালকে। অতীতের কাজকর্ম, ভুলত্রুটি আগামী দিনের সঠিক পথ নির্দেশ করে। অতীতকে জানা তাই প্রয়োজন।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ আমাদের মতই এ পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছে, নানান কাজ করেছে, নানান পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্তমানকালে পৌঁছেছে। এসব মজার কথা জানার পরে এ পৃথিবীটাকে আর বিভিন্ন জাতি ও দেশের সমাবেশ মনে হয় না। মনে হয় আমরা সব এক। ইতিহাসের এ এক বড় শিক্ষা।

প্রাচীন যুগের মানুষের কথা জানি কেমন করে?

পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর আগে। তারপর থেকে কত যুগ পেরিয়ে আমরা বর্তমান কালে এসেছি। মানুষ খুব বেশীদিন বাঁচলেও তার পক্ষে একশো বছরের বেশী বাঁচা সহজ নয়। তাহলে সেই প্রাচীন কালের মানুষের কথা আমরা জানলাম কেমন করে? প্রথম যুগের মানুষ লিখতে জানত না। তারা লিখতে শিখেছিল অনেক পরে। কিন্তু তাদের লেখা পুঁথিপত্রও সব ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই সেযুগের মানুষ সম্পর্কে ধারণা করা সহজ নয়। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাস এখন আমরা অনেকটা জানতে পেরেছি। কেমন করে? এই ইতিহাস কি শুধু গল্পকথা, শুধুই কল্পনা? ইতিহাস সত্য ঘটনার বিবরণ, তাতে মনগড়া কথার কোন স্থান নেই। জন্মকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষ তার সভ্যতার ক্রমবিকাশ কেমন করে ঘটাল, তারই বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ ইতিহাস। এই বিবরণ কয়েকটি জিনিসের উপরে নির্ভর করে লেখা হয়। সেগুলিকে ইতিহাসের উপাদান বলে।

প্রাচীন কালের, বিশেষ করে প্রাগৈতিহাসিক কালের, ইতিহাস রচনার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদানটি হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। সেযুগের মানুষ যে সকল গ্রাম ও শহরে বাস করত, সেগুলি মাটির নীচে চাপা পড়ে গেছে। সেখানে তৈরি হয়েছে অনেক ঢিবি বা স্তূপ। সেই স্তূপের মধ্যে ছড়িয়ে থাকত ভাঙ্গা ঘরবাড়ী, হাজার রকমের জিনিসপত্র। হাজার হাজার বছর পরে সেই সব স্তূপ খনন করে তখনকার জীবনযাত্রার পরিচয় জানা গেছে। মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতার বিবরণ এমনি-

ভাবেই আমরা জানতে পেরেছি। ঢিবি বা স্তূপ খুঁড়ে যাঁরা উদ্ধার-কার্য করেন, তাঁদের প্রত্নতত্ত্ববিদ বলা হয়। খননের পরে যে সব জিনিস পাওয়া গেছে, সেগুলি দিয়ে তখনকার মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পেরেছি। এই জিনিসগুলিকে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান।

সে যুগের মানুষের হাতিয়ার দেখে আমরা বুঝি তাদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল। পিকিং-এর কাছে একটি পাহাড়ের গুহায় পোড়া হাড় পাওয়া গেছে। আমরা জানতে পেরেছি, তখনকার মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত। ঘরবাড়ী তৈরি করার আগে তারা গুহায় থাকত। গুহার দেওয়ালে, ছাদে সুন্দর ছবি আঁকত। চারধারে যা দেখত, তাই আঁকত। স্পেন ও ফ্রান্সে এরকম চিত্রিত গুহা পাওয়া গেছে। ছবিগুলি দেখে আমরা সেযুগ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি।

চাষবাস প্রচলন হলে গ্রাম, শহর গড়ে উঠেছিল। ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, ব্যাবিলনের নগর-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আমাদের বিস্মিত করে। তখনকার মানুষ কবরের মধ্যে মৃতদেহের সঙ্গে জীবিত মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখত। তাই কবরের থেকেও আমরা অনেক খবর জানতে পারি।

মানুষ লিখতে শিখল। মঠ, মন্দির বা বাড়ীর দেওয়ালে, পাথরের টুকরো, বা থামের গায়ে, পাহাড়ের গায়ে, তামার ফলকে অনেক লেখা পাওয়া গেছে। এরকমের লেখাকে বলা হয় উৎকীর্ণ-লিপি হয়তো কোন রাজা পাহাড়ের গায়ে নিজের কীর্তিকাহিনী লিখে রেখে গেছেন। কেউ হয়তো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজের পরিচয়-বৃত্তান্ত লিখেছেন। আমাদের দেশের রাজা অশোক পাহাড়ের গায়ে প্রজাদের জন্য অনেক উপদেশ খোদাই করিয়েছিলেন।

সেকালে এখনকার মত কাগজ ছিল না। ছিল না ছাপাখানা। প্রাচীন ভারতে তালপাতায় লেখা হত। মিশরীয়রা নলখাগড়ার মত এক রকমের ডাঁটা জুড়ে জুড়ে এক রকমের জিনিস তৈরি করেছিল, নাম তার পেপিরাস। তার উপরে তারা লিখত।

ব্যাবিলনের লোকেরা লিখত নরম মাটির তৈরি ছোট ছোট টালির উপরে খাগের মত কলম দিয়ে। যে অক্ষরে তারা লিখত, তা পড়া সহজ নয়। পণ্ডিতেরা অনেক পরিশ্রম করে তার পাঠোদ্ধার করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সিন্ধুসভ্যতার লিপি এখনও পড়া যায় নি। পণ্ডিতেরা চেষ্টা করে চলেছেন।

অতীত ইতিহাসের আর এক সাক্ষী হচ্ছে প্রাচীন মুদ্রা। কোন কোন মুদ্রায় আছে রাজার মূর্তি, কোনটাতে আছে রাজার নাম, সন-তারিখ। আমাদের দেশের প্রাচীন রাজাদের অনেক মুদ্রা পাওয়া গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে মুদ্রার ব্যবহার হত। রোমদেশের মুদ্রা ভারতের কোথাও কোথাও পাওয়া গেছে। আমরা জানতে পেরেছি প্রাচীন কালে রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

লিখিত উপাদান আমাদের প্রাচীন ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে দেশের ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির অনেক কথা জানা যায়। হোমারের ইলিয়াড, ওডেসি থেকে প্রাচীন গ্রীসদেশের সমাজ ও সভ্যতার বিবরণ পাওয়া যায়।

মানুষের অতীত ইতিহাস সম্পূর্ণ জানা যায় নি। পণ্ডিতেরা নতুন তথ্য জানার জন্য চেষ্টা করে চলেছেন। হয়তো তোমরাই একদিন নতুন তথ্য আবিষ্কার করে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়াতে পারবে।

অনুশীলনী

১। ইতিহাস পড়ে আমরা কি জানতে পারি ?

২। মানুষের জীবনের অতীতকে জানা প্রয়োজন কেন ?

৩। ইতিহাসের শিক্ষা কি ?

৪। প্রত্নতত্ত্ববিদ কাদের বলা হয় ? প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কি ? প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কেমনভাবে প্রাচীন ইতিহাস জানতে সাহায্য করেন ?

৫। কি কি উপায়ে আমরা প্রাচীনকালের মানুষের কথা জানতে পারি ? এগুলির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান কোনটি ? কেন মূল্যবান মনে কর ?

৬। প্রাচীন ভারতবর্ষ ও প্রাচীন গ্রীসের লিখিত উপাদান সম্পর্কে কি জান

২। সভ্যতার সূত্রপাত

আদিম মানুষ ছিল অনেকটা বন্য পশুর মত। ধীরে ধীরে তারা প্রকৃতিকে বশে আনল। আগুনের ব্যবহার শিখল, হাতিয়ার তৈরি করল—প্রথমে ভোঁতা তারপরে ধারালো। তারা পশুপালন করতে শুরু করল, মনের ভাব প্রকাশ করল ছবিতে আর কথায়। হাজার হাজার বছর আগে এভাবেই এল মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন—সভ্যতার সূত্রপাত ঘটল। এই বিপুল পরিবর্তনের সময়কাল হল আনুমানিক ৪০ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

প্রথমে পৃথিবীতে জীবনের কোন চিহ্ন ছিল না। কেমন করে থাকবে? কোটি কোটি বছর আগে সূর্যের একটি অংশ থেকে পৃথিবী নামে গ্রহটির সৃষ্টি হয়েছিল। আর তখন এটি ছিল আগুনের গোলার মত। তখন মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর, এমনকি গাছপালার জন্মও সেখানে সম্ভব ছিল না। বহু যুগ কেটে গেল। পৃথিবীর দেহ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হল। তারপরে শুরু হল অবিরাম বৃষ্টি। অনেক ওলোট-পালোটের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে সমুদ্র, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হল। আরও অনেক পরে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হল, দেখা দিল গাছ-পালা আর নানারকমের জীবজন্তু। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল সবচেয়ে শেষে।

প্রাচীন যুগের মানুষ ॥ প্রথম যুগের মানুষের সঙ্গে আমাদের তফাত অনেক। প্রায় মানুষের মত চেহারার একটি জীব, লোমশ তার দেহ, অনেকটা গোরিলা বা শিম্পাঞ্জীর মত মুখ। তার কপাল ঝুলে থাকত, হাঁটত খুঁড়িয়ে। হাত ঝুলে থাকত হাঁটুর নীচে, আঙ্গুলগুলি অবিন্যস্ত। যেমনতেমন ভাবে সেগুলি সে নাড়াতে পারত না। কথা বলতে পারত না, মাত্র দুই একটি শব্দ করতে পারত। খাবারের সন্ধানে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। গাছের ফল সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করত। মাটি খুঁড়ে গাছের নরম মূল খেত। পাখির ডিম বা কখনও পাখি শিকার করে সে তার খাবারের সংস্থান করত। আবার কখনও ভোঁতা হাতিয়ার দিয়ে জন্তু-জানোয়ার

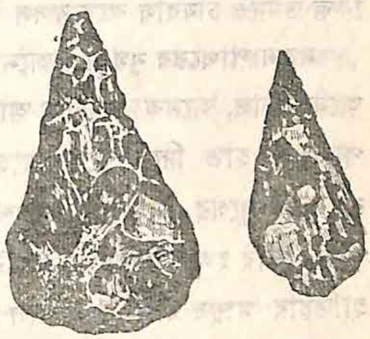
শিকার করত। প্রকৃতির থেকেই তখনকার মানুষ নিজের খাবার এভাবে সংগ্রহ করত। জীবজন্তুর মাংস সে কাঁচা চিবিয়ে খেত। আগুনের ব্যবহার সে জানত না। কাপড়-চোপড় পড়ত না। পশুর মত খোলা জায়গাতেই ঘুমাত। তারপর সে বুঝল, গাছের কোটরে বা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলে বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না, ঠাণ্ডা কম লাগে, জন্তু-জানোয়ারের হঠাৎ আক্রমণের ভয় থাকে না। তাই সে থাকতে লাগল গাছের কোটরে বা পাহাড়ের গুহায়। বন্যজন্তুর চামড়া জড়িয়ে গায়ের আচ্ছাদনও সে তৈরি করে নিতে পারল। তবে মানুষের বুদ্ধি ছিল অন্য সব জন্তুর থেকে বেশী। হাত পা যতই সচল হয়েছে, মানুষের বুদ্ধি ততই বেড়েছে। তাই প্রকৃতিকে নিজের বশে এনে মানুষ ধীরে ধীরে জীবজগতের রাজা হয়ে বসল।

আগুনের আবিষ্কার ।। আগুন জ্বালাতে শিখেই মানুষ প্রকৃতিকে প্রথম জয় করতে পারল। চীনদেশের পিকিং-এর কাছে চৌ-কু-টিয়েন পাহাড়ের গুহা থেকে মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। সেখানে প্রায় চল্লিশটি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এদেরই বলা হয়েছে "পিকিং-মানুষ", ইংরেজীতে (Peking-Man)। পণ্ডিতেরা মনে করেন, প্রায় তিনলক্ষ বছর আগেই এসব মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। যে গুহা থেকে এই কঙ্কালগুলি পাওয়া গেছে, সেখানে আগুন ব্যবহারের অনেক চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রায় তিনলক্ষ বছর আগেই মানুষ যে আগুনের ব্যবহার জানত, তা এর থেকে জানা যায়।

কেমন করে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখল? বনে তখন প্রায়ই আগুন লাগত। মানুষ দেখল আগুনের শক্তি অনেক। বনের হিংস্র পশু আগুনকে ভয় করে। আগুনের তাপে শীতও অনেকটা কমে যায়। বনের হঠাৎ লেগে যাওয়া আগুনকে সে তাই জ্বালিয়ে রাখতে চাইল শুকনো ডালপালা দিয়ে। তারপর একদিন হঠাৎ দুখানি শুকনো কাঠ বা দুটুকরো পাথর গায়ে গায়ে ঠুকে সে আগুন জ্বালাতে শিখে ফেলল।

আগুন আবিষ্কারের পরেই মানুষের শিকারী ও সংগ্রাহকের জীবন শেষ হয়ে গেল না। গাছের ফলমূল, জলের মাছ, বনের পশুপাখি দিয়েই মানুষ তার খাবার সংস্থান করতে লাগল। তবে এখন থেকে তার জীবন অনেকটা নিরাপদ হল। তাছাড়া মাংস কাঁচা না খেয়ে সে আগুনে পুড়িয়ে নিতে শিখল।

পুরাতন পাথরের যুগ॥ আমরা মানুষ হয়েছি আমাদের হাতের জোরে। আমাদের যেমন আছে, তেমন হাত আর কোন জানোয়ারের নেই। গোরিলার থাবা আছে। থাবা দিয়ে তারা কিছু আঁকড়ে ধরতে পারে। কিন্তু হাতিয়ার বানাতে পারে না। মানুষের হাত আছে, সে হাতিয়ার তৈরি করতে পারে। হাতিয়ার দিয়ে লড়াই করেই মানুষ প্রকৃতির থেকে তার বাঁচবার উপকরণগুলি আদায় করে নেয়। কোদাল, হাতুড়ি, কাস্তে, কুড়ুল, তীর-ধনুক—এমন অনেক হাতিয়ার তৈরি করতে পেরেছে বলেই তো মানুষ আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী। মনে রাখতে হবে, এসব বিবর্তন ঘটেছে হাজার হাজার বছর ধরে।



পুরানো পাথরের যুগের হাতিয়ার

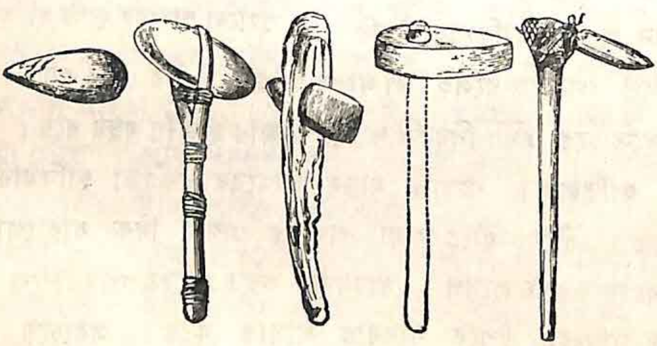
হাতিয়ার॥ প্রথমে মানুষ পাথরের ভোঁতা হাতিয়ার তৈরি করত। ধীরে ধীরে তারা পাথরের একটা দিক ধারালো করে ব্যবহার করতে লাগল। ধারালো করত হাতের পাথরটাকে একটা বড় পাথরের উপরে বারবার আঘাত করে। সবচেয়ে পুরানো হাতিয়ার বোধহয় হাত-কুড়ুল। হাত-কুড়ুল দিয়েই সে যুগের প্রয়োজনীয় সব কাজ করা যেত।

এতদিন সব কাজে এক ধরনের হাতিয়ার ব্যবহৃত হত। ধীরে ধীরে আলাদা কাজের জন্য আলাদা হাতিয়ার তৈরি হল। মাটির নীচের খাবার সংগ্রহের জন্য এল পাথরের লাঠি। বিশালকায় জন্তু-

জানোয়ার শিকার করার জন্য তৈরি হল বল্লমের মত হাতিয়ার। চ্যাপ্টা হাতিয়ার তৈরি হল মাংস কেটে, চেঁছে পরিষ্কার করবার জন্য।

শিকার ধরার জন্য মানুষ তখন ফাঁদ পাতত। একদল শিকারী কোন বড় জন্তুকে আগুন জ্বালিয়ে তাড়িয়ে ফাঁদে এনে ফেলত। অন্যদল তখন তাকে পিটিয়ে মারত। কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে পরিবর্তন এল। শিকারের জন্য অনেক মানুষের একসঙ্গে থাকার প্রয়োজন দেখা দিল। এখন থেকে তারা দলবদ্ধভাবে বাস করতে লাগল। পুরুষেরা সকলে মিলে শিকার করত। একসঙ্গে খাদ্য রান্না হত, সকলকে সমানভাবে পরিবেশন করা হত। মানুষ কিন্তু তখনও চাষবাস করে ফসল উৎপন্ন করতে শেখেনি।

নতুন পাথরের যুগ ॥ অনেক কাল কেটে গেল। এখন মানুষ অনেক ভাল, অনেক চকচকে আর খুব ধারালো হাতিয়ার বানাতে পারল। হাত দিয়ে ঘষে মেজে ধারালো হাতিয়ার তৈরি করাই হল এই যুগের বৈশিষ্ট্য। বাঁশের আগায় ধারালো অস্ত্র লাগিয়ে বল্লম তৈরি হল। হাতুড়ি, বাটালি, নেহাই, আরও কত রকমের হাতিয়ার মানুষ বানাতে শিখল। তীর-ধনুকের ব্যবহার মানুষ এ



নতুন পাথরের যুগের হাতিয়ার

সময়ে শিখে ফেলেছিল। কয়েক খণ্ড কাঠ একসঙ্গে জুড়ে মানুষ নৌকা বানিয়ে ফেলল। মোটা গাছের গুঁড়ি খুঁড়ে নৌকা তৈরি করতেও মানুষের দেরী হল না।

শিকার থেকে চাষবাস ॥ এই যুগের মানুষের মস্ত বড় আবিষ্কার

কৃষি। মানুষ কোন কোন ঘাসের বীজ খেত। ঘাসের বীজ ভিজে মাটিতে ছড়িয়ে দিলে তা থেকে নতুন ঘাস ও বীজ পাওয়া যায়, এই ব্যাপার জানার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার ইতিহাসে বিপ্লব এল। মানুষ শস্য উৎপাদনের মূল কথাটি জানতে পেরে চাষবাসের কাজে নামল। মাটি খুঁড়ে বীজ বোনার জন্য কোদাল তৈরি হল। আগাছা পরিষ্কার করবার জন্য তৈরি হল নিড়ানি। ফসল কাটার জন্য কাস্তের মত হাতিয়ার, ফসল ঝাড়াই-এর জন্য কুলোর মত ঝাড়নপাত্র। আর সেই ফসল গুঁড়িয়ে খাবারের উপযোগী করবার জন্য তৈরি হল জাঁতা আর শিলনোড়ার মত হাতিয়ার।

চাষবাস করে প্রথম ফসল ফলানোর কৃতিত্ব স্ত্রীলোকের। পুরুষেরা যখন শিকার করতে ব্যস্ত, স্ত্রীলোকেরা তখন ঘরে থাকত, শিশুদের দেখাশোনা করত। তারাই প্রথম লক্ষ্য করেছিল যে, বীজ থেকে গাছ হয়। তারাই প্রথমে কোদাল চালিয়ে শস্য উৎপাদন করেছিল। পরে পুরুষেরাই চাষবাস করতে থাকে। চাষবাস শুরু হয়েছিল আজ থেকে সাত-আট হাজার বছর আগে। তবে সব



চাষের কাজে পশু

দেশেই চাষবাস এক সময়ে শুরু হয়নি। প্রচুর জল আর অনুকূল আবহাওয়া যেখানে, সেখানেই চাষের শুরু হয়েছে।

পশুপালন ॥ চাষবাসের ফলে মানুষের দৈনন্দিন খাবারের অভাব মিটল। তার জীবনে এল অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য। খাবারের খোঁজে আর তাকে বনে বনে ঘুরতে হল না। এরপরে মানুষ আরও একধাপ এগিয়ে গেল। সে হয়ে উঠল পশুপালক। কুকুরই মানুষের প্রথম পোষা জন্তু। তারপরে গরু, ভেড়া, মোষ প্রভৃতি পশুকে সে পুষতে লাগল। হয়তো মানুষ বুঝেছিল, যে জমিতে গরু গাধা চরে বেড়ায়, সে জমি বেশী উর্বর। গোবরকে সার হিসেবে ব্যবহার করতে তারা শিখেছিল। চাষ ও মাল বইবার কাজেও পশুকে লাগানো হল।

কুমোরের চাক ॥ কাদামাটি দিয়ে মানুষ তার প্রয়োজনের থালা, বাটি ও নানারকমের পাত্র তৈরি করত। এতদিন এগুলি শুধু হাত দিয়েই তৈরি হত। এবারে মাটির পাত্র তৈরির কাজে চাকার ব্যবহার হল। দেখা দিল কুমোরের চাক। অনেক কম সময়ে প্রচুর পরিমাণে মাটির পাত্র খুব ভালভাবে তৈরি করা সম্ভব হল। তাছাড়া, মাটি দিয়ে মানুষ যেমন খুশী তেমন জিনিস তৈরি করতে পারল। পাথর বা হাড় নিয়ে এতসব কাজ করবার উপায় ছিল না। মাটি দিয়ে কাজ করতে গিয়ে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি বাড়তে লাগল।


কুমোরের চাক

পোষাক-পরিচ্ছদ ॥ পোষাক-পরিচ্ছদের সমস্যাটিও মানুষ অনেকটা সুরাহা করে ফেলল। ভেড়ার লোমের পশম থেকে ও তুলো পিঁজে সুতো বার করে মানুষ কাপড় বুনতে শিখেছিল। তিসি গাছের বাকল থেকে পাটের মত আঁশ বা রোঁয়া দিয়েও কাপড় বোনা হল। বড় বড় কাপড় বোনার জন্য হয়তো নানা-রকমের উপায়ও তাদের জানা ছিল।

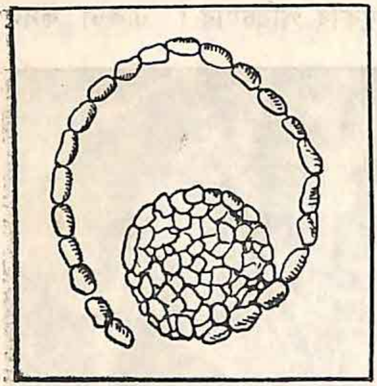
ঘরবাড়ী ॥ চাষের জন্য মানুষকে স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধতে হল। চাষের কাজে অনেক সময় লাগে, দরকার পরিচর্যার। একটা ফসল



প্রাচীন যুগের মানুষ

তুলতে না তুলতেই পরের ফসলের জন্য তৈরি হতে হয়। তাই মানুষের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। চাষবাস একজন বা দুজনের কাজ নয়। জমি তৈরি, বীজ বোনা, জলসেচের ব্যবস্থা করা—

এসব কাজে অনেক লোকের দরকার। অনেক মানুষকে তাই এক জায়গায় থাকতে হল। ফসল বাড়তি হলে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করতে হল। বসবাসের জন্য ও বাড়তি ফসল রাখবার জন্য মানুষ ঘরবাড়ী তৈরি করল। এভাবে গড়ে উঠল গ্রাম। ঘর-বাড়ী তৈরি করে মানুষ গোষ্ঠী-বদ্ধভাবে থাকতে লাগল। ঘর-বাড়ী মাটি বা পাথর দিয়ে তৈরি হত। বন্য জন্তু-জানোয়ার এবং শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য পাথরের পাঁচিল-ঘেরা ঘরবাড়ীর প্রচলন ছিল।



পাথর-ঘেরা কুটীরের পরিকল্পনা

যানবাহন ॥ বিভিন্ন জায়গার মানুষের মধ্যে জিনিসপত্রের আদান-প্রদান হতে লাগল। যাতায়াত বা মাল বইবার জন্য



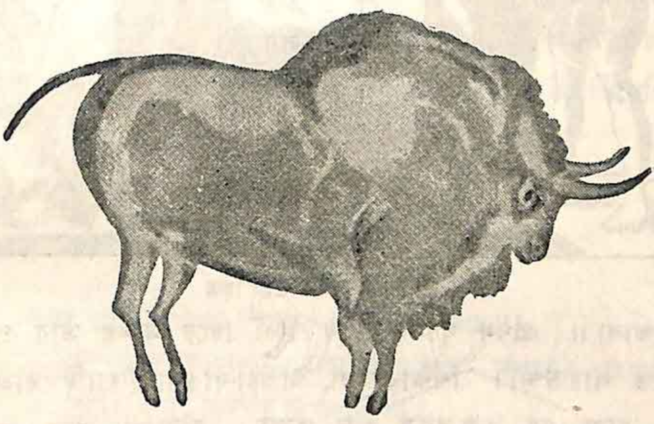
মাল বইবার কাজে পশু

মানুষ পশুকে কাজে লাগালো। ষাঁড়, গাধা বা খচ্চর দীর্ঘ পথ চলতে পারে, মানুষের চেয়ে ভারি জিনিস বইতে পারে। জিনিসপত্র আদান-প্রদানের কাজ খুব সহজ হয়ে উঠল। জলপথে নৌকার ব্যবহার ছিল।

গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ॥ পুরানো পাথরের যুগে মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করত। এই যুগে গড়ে উঠল আত্মীয়তা সূত্রে গাঁথা এক একটি গোষ্ঠী। কয়েকটি সজ্ঞাতি গোষ্ঠীকে নিয়ে গড়ে উঠল একটি ট্রাইব বা

উপজাতি। আগে সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। শিশুরা মাকেই চিনত। চাষবাস ও পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে বহুকালের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তন ঘটে। শ্রমসাধ্য চাষবাসের কাজ স্ত্রীলোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। একাজ করা পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। ধীরে ধীরে তাই পুরুষেরা সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে। নারীরা তখন শুধু গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠল। পিতৃতান্ত্রিক যুগ মানব ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কেননা, এই যুগ থেকেই আরম্ভ হয় ধাতুর ব্যবহার।

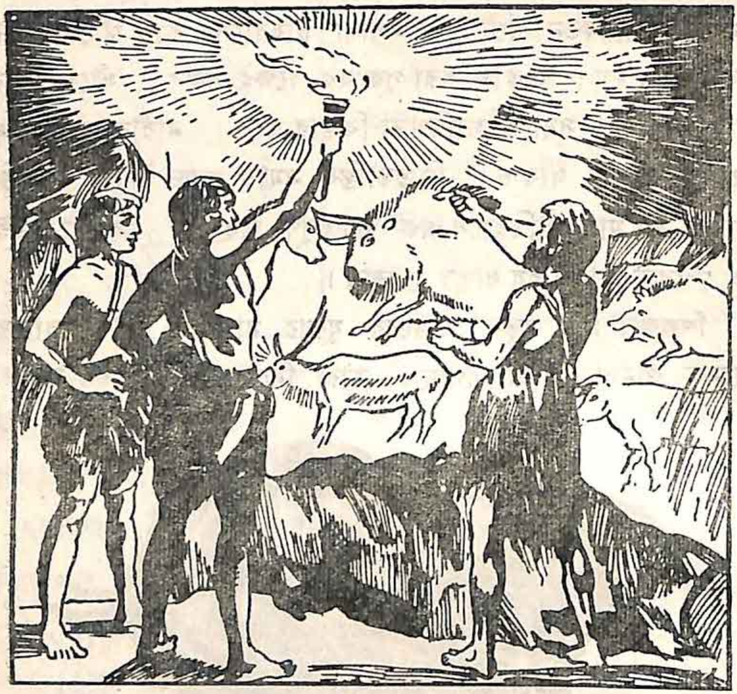
শিল্পকলা ।। নতুন পাথরের যুগের মানুষের সৌন্দর্যবোধের অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারা নিজেদের দেহে রঙ মাখত,



আলতামিরা গুহার ছবি—বাইসন

নানান রঙের পাথর আর ঝিনুকের মালা পরত। মাটির পাত্রে নক্সা আঁকত, নানারকমের রঙ করত। পাহাড়ের গুহায় সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকত। ছবিগুলির অধিকাংশ তাদের বিশেষ পরিচিত জন্তু-জানোয়ারের। স্পেন দেশের আলতামিরা গুহার দেওয়ালে ও ছাদে খুব সুন্দর রঙিন ছবি আঁকা আছে। এসব ছবির মধ্যে অনেক পশু—বড় হাতী, বাইসন, বুনো ঘোড়া, হরিণ, ষাঁড়—হুবহু আঁকা আছে। কত রঙের বাহার আর কত সুন্দর

আঁকবার কৌশল! ছবিগুলি থেকে ধারণা করা যায়, তখনকার মানুষ অন্নবস্ত্রের জন্য কি ধরনের প্রাণী পালন ও বধ করত।



আলতামিরার গুহা চিত্র

ভাষা ॥ প্রথম যুগে মানুষ কথা দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারত না। শিকার করা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বোঝাবার জন্য তারা এক এক রকম শব্দ করত। হাত-পা নেড়ে সঙ্কেতে কাজ সারত। ধীরে ধীরে মানুষ কথা বলতে পারল। মনের ভাব প্রকাশের খুব সুবিধা হল। কথাকে লেখায় পরিণত করতে মানুষের অনেক সময় লেগেছিল। মাত্র পাঁচ হাজার বছর হল মানুষ লিখতে শিখেছে।

ধর্মবিশ্বাস ॥ সে যুগের মানুষ চাষ আবাদ করতে শিখেছিল। নৌকা ভাসিয়ে চলতে শিখেছিল। কিন্তু প্রকৃতির শক্তির কাছে তারা ছিল অসহায়। বিদ্যুৎ চমকালে তারা ভয় পেত। ঝড়ে তাদের নৌকা উল্টে যেত। নদীর জলে বন্যা এলে ভেসে যেত তাদের

ঘরবাড়ী। আবার তারা দেখত মাটিতে শস্য জন্মায়। নদীর জল ছাড়া শস্য ভাল ফলে না। সূর্যের আলো আর তাপেই ফসল পাকে। প্রকৃতির এই শক্তি তাদের মনে ভয় ও বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। তারা ভাবত, নদীর অদৃশ্য শক্তি আছে। তাকে খুশী রাখতে পারলে বন্যা হবে না। চাষবাস ভাল হবে। আকাশের অদৃশ্য শক্তি তুষ্ট থাকলে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। অদৃশ্য শক্তিকে খুশী করার মধ্য নিয়েই দেবপূজার প্রচলন হল। তারা মনে করত স্ত্রীমূর্তি উর্বরতার প্রতীক। মাটিতে ফসল জন্মায়, ঘরের স্ত্রীলোক সন্তান জন্ম দেয়। তাই তারা স্ত্রীলোককেই উর্বতার প্রতীক কল্পনা করেছিল। তারা স্ত্রীমূর্তি গড়ে পূজা আরম্ভ করল। অবশ্য জন্তু-জানোয়ার বা পুরুষ মূর্তিকেও পূজা করা হত।

মানুষের জীবনে এত পরিবর্তন তাড়াতাড়ি আসেনি। হাত কুড়ুলের সময় থেকে চাষবাসের যুগ—এর মধ্যে কেটে গিয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর।

অনুশীলনী

১। প্রথম যুগের মানুষেরা কিভাবে জীবন যাপন করত ?

২। কেমন করে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখল ? আগুনের ব্যবহারের প্রাচীনতম প্রমাণ কোথায় পাওয়া গেছে ?

৩। হাতিয়ার বলতে কি বোঝ ? পুরানো পাথরের যুগের হাতিয়ারের সঙ্গে নতুন পাথরের যুগের হাতিয়ারের পার্থক্য কোথায় ?

৪। মানুষের জীবনে চাষবাস কি পরিবর্তন আনল ?

৫। কুমোরের চাক মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন আনল ?

৬। প্রাচীনযুগে কিভাবে গ্রাম গড়ে উঠেছিল ?

৭। প্রাচীন গুহাচিত্র কিসের পরিচয় দেয় ?

৮। প্রাচীন যুগের মানুষের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে কি জান ?

৩। তামা ও ব্রোঞ্জের যুগ

তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার সভ্যতার বিকাশে দ্রুত পরিবর্তন আনে। ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ব্যবহারের ফলে ফসলের উৎপাদন অনেক বাড়ল। ক্রমে কারিগরী দক্ষতার প্রসার ঘটে। বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা হল, উদ্ভব হল বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর। বহু গ্রাম শহরে পরিণত হল। উৎপাদনের ভিত্তিতে সমাজে শ্রেণী-বিভাগ দেখা দিল—ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হল। আর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ধনীদের স্বার্থে সৃষ্টি হল রাষ্ট্রযন্ত্র। এসব ঘটনা ঘটে আনুমানিক ৪০০০-২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে।

নগর সভ্যতার বিকাশ

চাষবাস করতে শিখে মানুষ সভ্যতার পথে পা বাড়িয়েছিল। এখন ধাতুর আবিষ্কার ও তার ব্যবহার করতে পেরে মানুষ আরও একধাপ এগিয়ে গেল। মানুষ প্রথম ধাতুর হাতিয়ার তৈরি করল তামা দিয়ে। পাথর, কাঠ বা হাড়ের হাতিয়ার থেকে তামার হাতিয়ার অনেক মজবুত ও ধারালো ছিল। তাছাড়া তামা গলানো যায়। তাই তামা দিয়ে মানুষ তার ইচ্ছামত অনেক জিনিসপত্র তৈরি করতে পারল। পাথর, কাঠ বা হাড় দিয়ে সেটা সম্ভব ছিল না।

তামা ও ব্রোঞ্জের আবিষ্কার॥ তামা সহজে পাওয়া যায় না। পাহাড়, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মানুষ হঠাৎ তামার সন্ধান পেয়েছিল। তামা খুঁজতে গিয়ে মানুষের হাতে এল আরও অনেক ধাতু—টিন, সীসা আর রূপা। রূপার গয়না গড়ে মানুষ নিজেকে সাজাতে শিখল। ব্রোঞ্জ তৈরি হল তামার সঙ্গে টিন গলিয়ে। ব্রোঞ্জ বেশ শক্ত ও মজবুত ধাতু। ব্রোঞ্জের হাতিয়ার যেমন কঠিন ও মজবুত, তেমন ধারালো। ধাতুর ফাল দেওয়া লাঙ্গল গাধা বা ষাঁড়ের পিঠে লাগিয়ে চাষ আরম্ভ হল। ফলে অনেক বেশী জমি চাষ করা সম্ভব হল। ফলনও বাড়ল যথেষ্ট। তাছাড়া ধাতুর নতুন হাতিয়ার মানুষের অনেক সময় বাঁচালো। এখন আর ভাঙ্গা হাতিয়ার নতুন করে তৈরি করার কাজে মানুষকে সময়

নষ্ট করতে হল না। মানুষ অন্যরকমের কাজে অনেক সময় দিতে পারল। এই সময়ে মানুষ ঘরবাড়ি তৈরির কাজে ইঁটের ব্যবহার করতে শিখেছিল।

গ্রাম থেকে শহর॥ চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে লোকের বসতি বাড়তে লাগল। ঘন বসতির ফলে কতকগুলি গ্রাম বড় হয়ে শহরে পরিণত হল। শহর গড়ে ওঠার ফলে মানুষ সভ্যতার পথে আরও অনেকটা এগিয়ে গেল। ধীরে ধীরে শহরগুলি ব্যবসা-বাণিজের কেন্দ্র হয়ে উঠল।

কারিগরী দক্ষতা॥ তামা ব্রোঞ্জের হাতিয়ার বানানো, ইঁট তৈরি করা—এরকম সব কাজের জন্য দক্ষতার প্রয়োজন। সমাজের প্রয়োজনে এখন থেকে কেউ করতে লাগল কামারের কাজ। কেউ কুমোর—মাটির বাসনপত্র তৈরিই তার একমাত্র কাজ। ছুতোর কাঠের কাজ নিয়েই রইল। কেউ শুধু কাপড়ই বুনত। জেলে শুধুই মাছ ধরত। কামার, ছুতোর, কুমোর, রাজমিস্ত্রী—নিজের নিজের কাজে পটু হয়ে উঠল এবং দক্ষ কারিগরে পরিণত হল। খাবারের চিন্তা তাদের ছিল না। ফসল এখন বাড়তি। বাড়তি খাবারের বিনিময়ে তারা সমাজের প্রয়োজনীয় কাজ করছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য॥ এভাবে উৎপাদনের বিনিময় শুরু হল। কামার তার কাজ করে দিচ্ছে। প্রতিদানে চাষীর কাছ থেকে সে পাচ্ছে খাদ্যশস্য। তাঁতী কাপড়ের বিনিময়ে খাদ্যশস্য যোগাড় করল। কুমোর তার মাটির জিনিস বিনিময় করে অন্নের সংস্থান করত। এই লেনদেনই ব্যবসার প্রথম স্তর। শহরে শহরে বা শহরে গ্রামে জিনিসপত্রের বিনিময় শুরু হল। কুমোরের চাক তৈরি করতে পেরে চাকা ব্যবহারের মূল তথ্যটি মানুষ শিখেছিল। তাই চাকার গাড়ী তৈরি করতে বেশী দেরী লাগল না। চাকার গাড়ী যাতায়াত সহজ করল, মালপত্র বহন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথও প্রশস্ত

করল। জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দেখা দিল পালখাটানো নৌকা। বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হল।

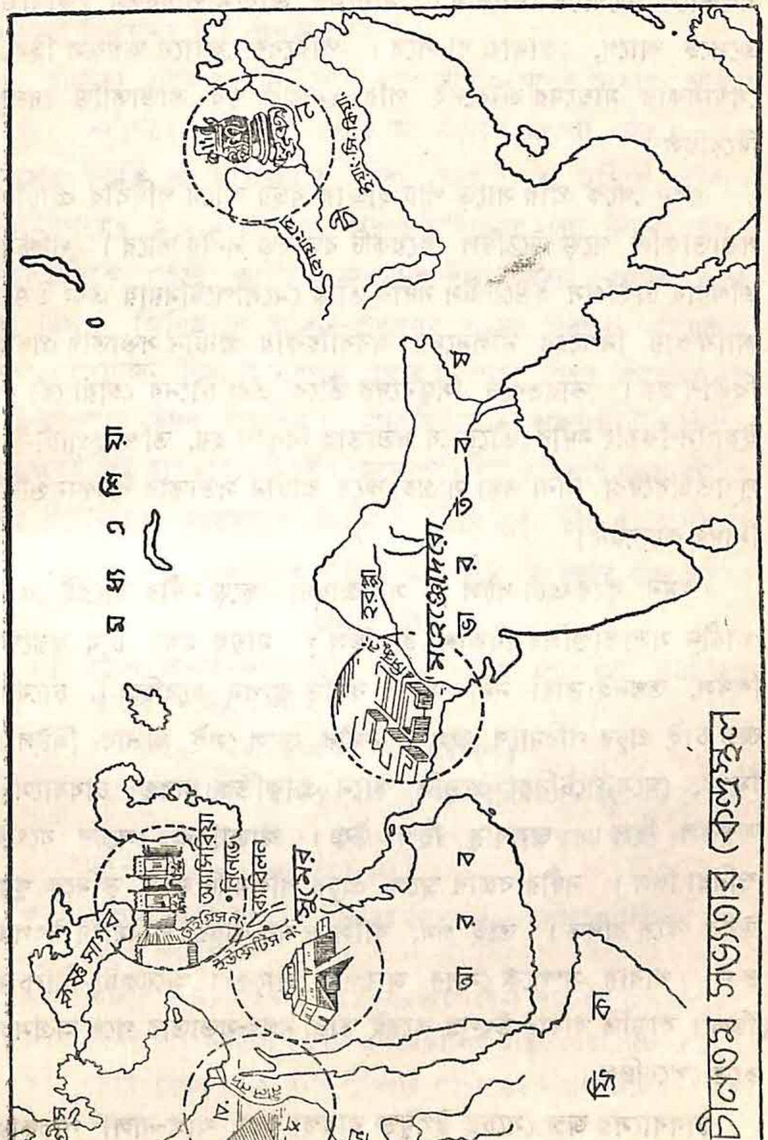
শ্রেণী-বিভাগ॥ সমাজে বিনিময় ব্যবস্থা চালু হওয়ায় অনেক রকম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল। কাজের ভিত্তিতে এখন কেউ চাষী, কেউ কারিগর, কেউ বণিক, আবার কেউবা পুরোহিত। বিনিময়-প্রথা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন পরিবার ধনী হয়ে উঠল। উৎপাদন যতই বাড়ানো যাবে, বিনিময় ততই করা যাবে। তাই উৎবাদন বাড়িয়ে ধনী হওয়ার লোভ দেখা দিল।

এই লোভ থেকেই জমিতে বড় মালিকানার সৃষ্টি হল। অনেক লোক খাটিয়ে উপজাতি প্রধানরা নিজেদের পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে লাগল। তাদের হাতে এল সবচেয়ে উর্বর আর বহু জমি। আবার অনেকের ভাগে পড়ল সামান্য জমি। অনেকের ভাগে কোন জমিই রইল না। এইভাবে ধনী পরিবারের পাশাপাশি দেখা দিল গরীব পরিবার। ধনী ব্যক্তির পাশে গরীব ব্যক্তি। দরিদ্ররা সে যুগেও নিপীড়িত হত।

লোক খাটানোর কাজে এখন থেকে দাস লাগানো হল। যুদ্ধে জিতে যাদের বন্দী করা হত, তারাই দাস হত। আগে তাদের হত্যা করা হত। এখন থেকে তাদের জমির কাজে লাগানো হল। দাসেরা প্রভুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত। এভাবে শ্রেণীভেদের উপর ভিত্তি করেই নতুন সমাজ দেখা দিল।

রাষ্ট্র ব্যবস্থা॥ সমাজে আগের মত সাম্য রইল না। জটিলতা দেখা দিল। উপজাতি প্রধানদের মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদের জন্য বিবাদ বাড়তে লাগল। সমাজে তাই নিয়ম কানুনের প্রয়োজন দেখা দিল। এই নিয়মকানুন মানা এবং মানাবার লোক চাই। যারা মানবে না তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। শাস্তির ব্যবস্থা কার্যকরী করবার জন্য এবং শান্তি রক্ষার জন্য সেপাই প্রয়োজন। আবার একটি উপজাতি সমাজকে অন্য উপজাতি

সমাজের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য সৈন্যসামন্ত রাখারও প্রয়োজন ছিল। এই সব প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।



প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্রস্থল

নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতা ॥ মানব সমাজের অগ্রগতির ধারা ছিল খুবই মন্থর। আবার পৃথিবীর সব জায়গায় মানুষ এক সময়ে বা একভাবে এগোতে পারেনি। মানুষের জীবনে পরিবর্তন কোথাও এসেছে আগে, কোথাও বা পরে। পরিবেশ যেখানে অনুকূল ছিল, সেখানকার মানুষের জীবনেই পরিবর্তনগুলি খুব তাড়াতাড়ি দেখা দিয়েছিল।

এখন থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল কয়েকটি বড় বড় নদীর তীরে। পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়ায় এবং উত্তর আফ্রিকায় মিশরের নীলনদের অববাহিকায় প্রাচীন সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয়। ভারতবর্ষে সিন্ধুনদের তীরে এবং চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসি-কিয়াং নদীর তীরে যে সভ্যতার বিকাশ হয়, তাও সুপ্রাচীন। পুরাতত্ত্ববিদেরা নানা তথ্য সংগ্রহ করে প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থানগুলি নির্দিষ্ট করেছেন।

কেমন করে এটা ঘটল? সব জায়গা ছেড়ে নদীর তীরেই কেন প্রাচীন সভ্যতাগুলির বিকাশ হয়েছিল? মানুষ যখন চাষ করতে শিখল, তখনই তারা নদীর ধারে বসতি স্থাপন করেছিল। চাষের জন্য চাই প্রচুর পরিমাণে জল। নদীর জলে সেই অভাব মিটল। মিশর, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রাকৃতিক অবস্থা চাষবাসের অনুকূল ছিল। জলবায়ু ছিল উষ্ণ। স্বাভাবিক সেচের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। নদীর বন্যার জলে প্রচুর পলিমাটি জমে ভূমিকে খুব উর্বর করে রাখত। তাই গম, বার্লি ও যব প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। খাবার সম্পর্কে সেসব জায়গার লোকেরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল। বাড়তি খাবার উৎপন্ন করেই তারা নগর-সভ্যতার পথে অগ্রসর হতে পেরেছিল।

চাষবাসের জন্য সেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, খাল-নালা পরিষ্কার রাখা, বাঁধ তৈরি করা—এসব কাজের জন্য বহু লোকের দরকার হল।

এভাবে ঘনবসতি দেখা দিল। ছোট ছোট গ্রাম শহরে পরিণত হল। আর সভ্যতার বড় বিশেষত্ব হল শহর। শহর গড়ে ওঠার ফলেই সভ্যতা বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়।

তাছাড়া এসব জায়গা থেকে যাতায়াতের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ছিল। নদীপথে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া যেত। এক দেশের উন্নতি ও অভিজ্ঞতার সম্পদ অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ল। জিনিষপত্রের আদান-প্রদানে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হল। শহরগুলিকে কেন্দ্র করেই ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। জিনিসপত্র আদান-প্রদানের সময়ে সুরক্ষার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল হিসেবপত্র রাখার। আর এসব প্রয়োজনেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। নগর-সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। মেসোপটেমিয়া ও মিশরে এরূপ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। ভারতবর্ষের সিন্ধুনদের তীরে এবং চীনের হোয়াংহো নদীর তীরেও নগর সভ্যতাকে ভিত্তি করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম হয়।

অনুশীলনী

১। মানুষ প্রথমে কোন কোন ধাতুর ব্যবহার শেখে এবং তার ফলে তাদের কি উন্নতি হয়?

২। গ্রাম থেকে শহরের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল?

৩। কারিগর কাদের বলে? সে যুগের কারিগরদের কয়েকটি পেশার নাম করতে পার কি? কোন কারিগর কোন কাজ করত? তারা খাবারের সংস্থান কিভাবে করত?

৪। প্রাচীনযুগে উৎপাদনের বিনিময় কেমনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করেছিল?

৫। প্রাচীন সমাজে শ্রেণীবিভাগ কেমন করে দেখা দিয়েছিল?

৬। কেমন করে এবং কেন সেই প্রাচীনকালেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে?

৭। কোন কোন নদীর ধারে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির বিকাশ হয়? নদীগুলি কোন দেশে অবস্থিত?

৮। নদীর ধারে প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির বিকাশ হয়েছিল কেন?

৯। একটি মানচিত্র এঁকে নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতার স্থানগুলি নির্দেশ কর।

৪। সভ্যতার আদিকাল

নগর সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় মেসোপটেমিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায় মিশরের নীল নদের তীরে, সিন্ধু নদের তীরে ভারতবর্ষে এবং চীনে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকায় উন্নত নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এই সুপ্রাচীন নগর-সভ্যতার সময়কাল আনুমানিক ৪৫০০-২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ।

মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু উপত্যকা ও চীন

মানব সভ্যতার ইতিহাস জানতে গিয়ে আমরা এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এসে পৌঁছেছি। আদিম যুগ থেকে ঐ সময়ের মধ্যে মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কুমোরের চাক, চাষবাস, তামা, ব্রোঞ্জ, চাকার গাড়ি, পালতোলা নৌকা, বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্য মানুষের জীবনকে অনেকটা পাল্টে দিয়েছে। গ্রাম থেকে গড়ে উঠেছে নগর। আর নগরকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলির উদ্ভব। আমরা আগেই জেনেছি পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায়, মিশরে নীলনদের তীরে, ভারতবর্ষে সিন্ধু উপত্যকায় ও চীনে হোয়াংহো নদীর তীরে, প্রাচীন সভ্যতাগুলির বিকাশ হয়েছিল। মনে রাখতে হবে এই সভ্যতাগুলি ছিল নগর-সভ্যতার পরিপূর্ণ নিদর্শন। লক্ষণ ও চরিত্রের দিক থেকে অনেক মিল থাকলেও আমরা এবার আলাদাভাবে প্রাচীন সভ্যতাগুলির পরিচয় জানব।

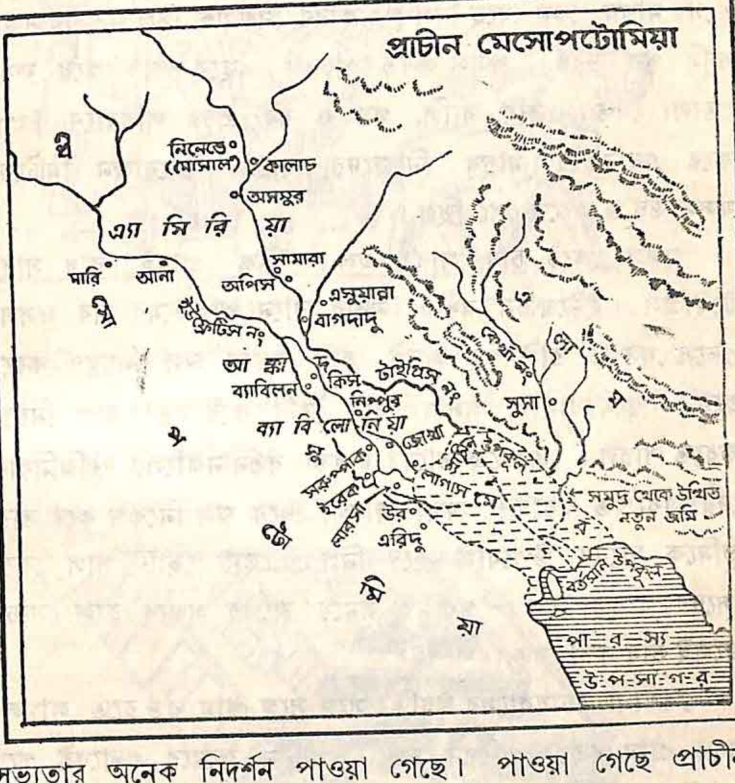
মেসোপটেমিয়া

প্রাচীনত্ব ॥ পশ্চিম এশিয়ার দুটি নদী—টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস। মিশেছে পারস্য উপসাগরে। এই দুই নদীর বাহুবন্ধনে ছোট একটি দেশ, যাকে আমরা এখন ইরাক বলে জানি। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলটিরই নাম ছিল মেসোপটেমিয়া। নামটি গ্রীকদের দেওয়া।

মেসোপটেমিয়া নামে কোন দেশ অতীতে ছিল না। আমরা যে সময়ের ইতিহাস জানতে যাচ্ছি তখন এই অঞ্চলের উত্তরাংশের নাম ছিল অ্যাসিরিয়া, দক্ষিণাংশের নাম ব্যাবিলনিয়া। ব্যাবিলনিয়ার

উত্তরভাগের নাম আক্কাদ আর দক্ষিণভাগের নাম সুমের। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা বলতে আমরা সুমের সভ্যতাকেই বুঝি।

সুমেরের ইরেক, এরিদু, লাগাস, উর প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি ঢিবি পাওয়া গেছে। উত্তরে আক্কাদে পাওয়া গেছে কিছু ঢিবি। তবে সেগুলি পরবর্তীকালের। সুমেরের ঢিবিগুলি খুঁড়ে সুপ্রাচীন



সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে প্রাচীন লিপি। পণ্ডিতেরা সে লিপি পাঠ করতে পেরেছেন। তাই তো আমরা জেনেছি, আজ থেকে প্রায় পাঁচহাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে সুমেরে যে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল তা সবচেয়ে প্রাচীন।

অতীতের সুমের ছিল বিস্তীর্ণ জলাভূমি। জলাভূমির কোথাও নলখাগড়ার জঙ্গল, কোথাও খেজুর গাছের সারি। হয়তো

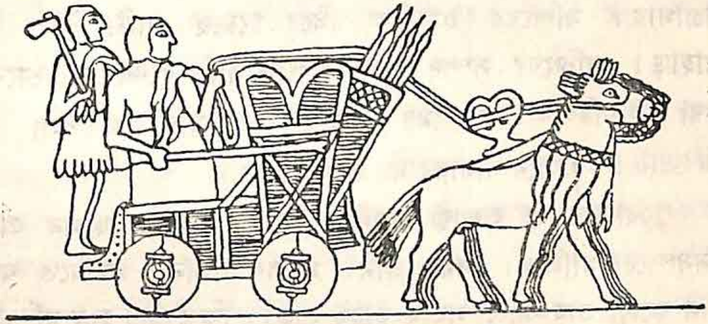
তারপরেই অনেকটা জায়গা জুড়ে মরুভূমির মত শুকনো মাটি। মাঝে মাঝেই টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর বন্যার জল সমস্ত এলাকাকে ডুবিয়ে দিত।

ফসল ও বন্যা প্রতিরোধ ॥ তোমরা ভাবতে পার, এমন অঞ্চলটাকে চাষবাস করা ও স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ী বাঁধার জন্য সে যুগের মানুষ কেন বেছে নিল? কারণ নিশ্চয়ই ছিল। এখানকার জমি খুব উর্বর। ফসল ফলত প্রচুর। বছরে ছুবার করে ফসল তোলা যেত। তাই বার্লি, গম ও যব প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করে এখানকার মানুষ নিজেদের খাদ্যের প্রয়োজন মিটিয়েও ফসল উদ্বৃত্ত করতে পেরেছিল।

জঙ্গল কেটে চাষ আরম্ভ হল। কিন্তু প্রায়ই বাধ সাধত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী। নদীর বানে পরিশ্রমের সব ফসলই ভেসে যেত। তাই যে করেই হোক বন্যার জল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সুমেরবাসীরা অসংখ্য বাঁধ তৈরি করে বন্যার জল নিয়ন্ত্রণ করতে পারল। একাজে তাদের দক্ষতা বর্তমানকালের এঞ্জিনিয়ার-দেরও বিস্মিত করবে। জলা জায়গা থেকে জল নিকেশ করে তারা ভূমিকে চাষের উপযোগী করে নিল। ছোট ছোট খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা হল। গরমের সময়ে জলের অভাব হলে সেচের জলেই চাষ করা যেত।

পেশা ॥ চাষবাসের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম বড় হতে লাগল। সমৃদ্ধ গ্রাম শহরে পরিণত হল। প্রাচীন সুমেরে এভাবেই গড়ে উঠেছিল ইরেক, এরিছু, লাগাস, উর প্রভৃতি বড় বড় শহর। ব্যবসা-বাণিজ্যে সুমেরবাসীরা বেশ উন্নত ছিল। নদীপথে জিনিসপত্র লেনদেনের সুবিধা ছিল। শস্যের বিনিময়ে নানা অঞ্চল থেকে তারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনত। জলা জায়গা বলে সুমেরে কাঠ পাওয়াই যেত না। তাই তামা ব্রোঞ্জের কাজে তারা খুব দক্ষ ছিল। কামার তামা ও ব্রোঞ্জের বাসনপত্র তৈরি করত, তাঁতী

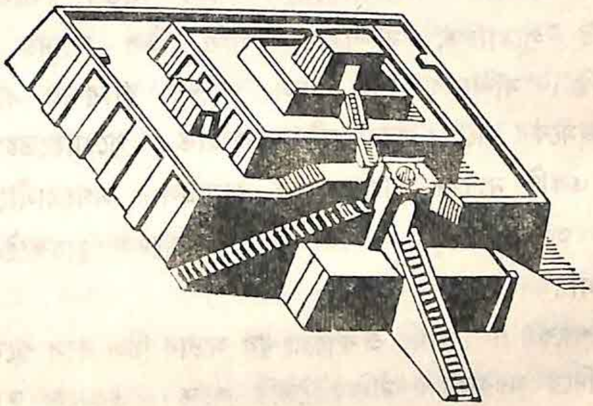
পশম দিয়ে কাপড় বুনত, মেয়েরাও সুতা কাটত, কাপড় বুনত। মাটি দিয়ে ইঁট তৈরি করা হত। সেই ইঁট দিয়ে তৈরি হত বড় বড় বাড়ী আর মন্দির। ভারী মাল বইবার কাজে চাকা লাগানো গাড়ীর ব্যবহার ছিল। ছুতোরের কাজ ছিল চাকাওয়ালা গাড়ী তৈরি করা।



সুমেরদের ব্যবহৃত চাকাওয়ালা রথ

নগরে নগরে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। আবার যুদ্ধও হত। বিজয়ীরা নগর জয় করে বিজিতদের দাস করে নিত। সুমেরবাসীরা যুদ্ধবিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিল।

মন্দির স্থাপত্য ॥ সুমেরের প্রত্যেক নগরে এক একটি



জিগুরাট

অভিভাবক দেবতা ছিলেন। মাতৃদেবী ইলিনা, ইরেক নগরে তাঁর মন্দির। জ্ঞানের দেবতা আ, মন্দিরটি এরিদুতে। উর নগরেও

এরকমের মন্দির পাওয়া গেছে। বায়ু দেবতা এন্‌লিলের মন্দির ছিল নিপ্‌পুরে। মন্দিরগুলি যেমন বিরাট, তেমনি সুন্দর। সবচেয়ে ভাল ও দামী জিনিসপত্র দিয়ে মন্দির সাজানো হত। মন্দিরের বিশাল চত্বরের মধ্যে থাকত শস্যাগার, কামারশালা ও অস্ত্রাগার। মন্দিরের চারদিক ঘিরে রয়েছে মাটির তৈরি উঁচু পাহাড়। মন্দিরের সম্পদ সুরক্ষার পাকাপাকি বন্দোবস্ত এভাবেই করা হয়েছিল। এরকমের পাহাড়-ঘেরা মন্দিরকে বলা হয় জিগুরাট। এখানে নানাধরনের উৎসব চলত।

পুরোহিত ও অন্যান্য শ্রেণী ॥ নগর দেবতা ছিলেন প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। সমস্ত জমির মালিক তিনি। জমিতে যারা বাস করে, চাষ করে, সবাই তাঁরই প্রজা। কিন্তু তাঁর হয়ে মন্দিরের সব সম্পত্তি ভোগ করত পুরোহিতেরা। ফলে নগর দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে পুরোহিতেরা নগরগুলির সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিল নগরের প্রধান ব্যক্তি। সে কর আদায় করত, খাল কাটার নির্দেশ দিত, বাঁধের তদারক করত, বিচার করত, ব্যবসা-বাণিজ্যেও অংশ নিত। আসলে এরা নামেই পুরোহিত, মন্দিরের সম্পত্তি ছিল তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মন্দিরের দাস ছিল তাদের ব্যক্তিগত দাস। খুব জাঁকজমকের মধ্যে তারা জীবন কাটাত। পুরোহিতেরা এভাবে এক একটি নগরের রাজা হয়েই বসেছিল। নগরবাসীদের মধ্যে ছিল অনেক মজুর ও কারিগর। তাদের দুঃখকষ্টের সীমা ছিল না।

শিল্পকর্ম ॥ পাথর ও কাঠের খুব অভাব ছিল বলে সুমেরবাসীরা ইঁট দিয়ে ঘরবাড়ী ও মন্দির তৈরি করত। একাজে তারা খুবই দক্ষ ছিল। মাটির পাহাড় দিয়ে ঘেরা মন্দিরগুলি তাদের কারিগরী প্রতিভার পরিচয় দেয়। পাহাড়ের গায়ে পোড়ামাটির খুড়ি লাগিয়ে নানা রঙে রঙ করা হত। এখন তোমরা মোজাইক করা

দালান-কোঠা দেখছ। দেখতে বেশ সুন্দর। সেই প্রাচীনকালেই সুমেরবাসীরা নানারকমের রঙ ব্যবহার করে মোজাইকের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল। পাথর খোদাই করে বা বিচিত্র রঙের ঝিনুক সাজিয়ে জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি গড়ত তারা। তাই দিয়ে তারা মন্দিরের ভেতরের দেওয়াল সাজাত। তামা বা সোনার সূক্ষ্ম তার দিয়েও মন্দির সাজানো হত।

যানবাহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপার ব্যবহার সুমেরবাসীরা ভাল্‌ভাবেই শিখেছিল। তামা দিয়েই তারা অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করত। সোনার তারের সুন্দর গয়না গড়ত। মণি-মুক্তোর মালা তৈরি করে পরত। চুনাপাথর, ব্যাসল্ট পাথর দিয়েও তারা সুন্দর মূর্তি গড়তে পারত।

পশু-টানা চার চাকার গাড়ী আর নৌকাই ছিল সে যুগের প্রধান যানবাহন। নৌকা নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমানো গেল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল। নগর-সভ্যতার উপকরণগুলি সুমেরে বেশী পাওয়া যেত না। বাইরের থেকে আমদানি করতে হত। তামা, টিন, পাথর, সোনা, রূপা, কাঠ বিদেশ থেকে আনতে হত। হয়তো মিশর ও সিন্ধুনদের তীরের নগরগুলির সঙ্গে সুমেরের বাণিজ্য চলত। এখানকার শিল্পজাত দ্রব্য অন্য বাজারে বিক্রি হত।

লিপি ॥ সেই প্রাচীন যুগেই সুমেরে লিখন-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। মাটির নরম টালির উপরে খাগের মত কলম বা কাঠি দিয়ে তারা লিখত। সুমেরবাসীরা টালিতেই চিঠি লিখত, হিসাব রাখত, আবার কঠিন বিষয়ের বইও লিখত। টালিগুলিকে পরে রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হত। এ ধরনের শক্ত টালি সহজে নষ্ট হয় না। তাই এরকমের অনেক টালি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের লেখাগুলি দেখতে খোঁচা খোঁচা তীরের ফলার

মত। সুমেরীয় লিপিকে সেজন্য বলা হয় বাণমুখ লিপি। ইংরেজীতে বলে কিউনিফর্ম।



বাণমুখ লিপির ক্রমবিকাশ

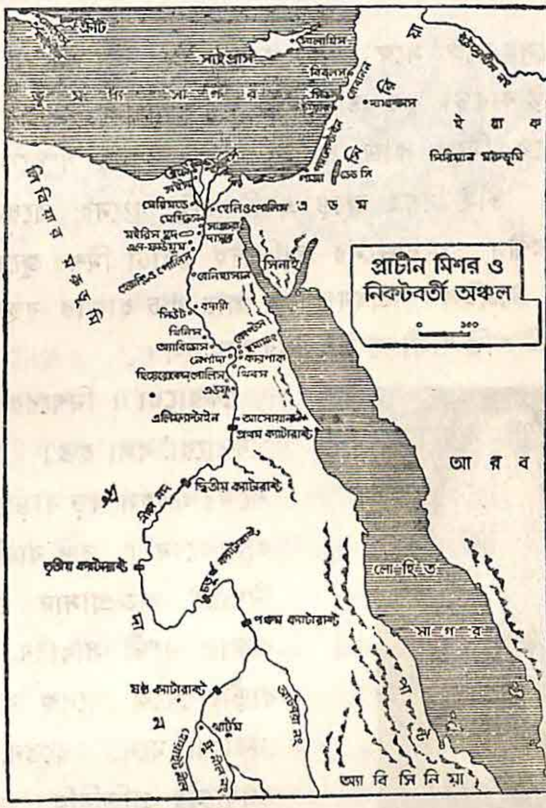
এই লিপির আদি রূপ ছিল ছবি। কোনটা হয়তো ষাঁড়ের মাথা, কোনটা পায়ের মত দেখতে, আবার কোনটা দেখতে ত্রিভুজের মত। এভাবে ছবি এঁকে লেখার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপি ক্রমশঃ ফলাযুক্ত বাণচিহ্নে দাঁড়িয়েছে। চিত্রটি দেখলে তোমরা এ বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবে।

মিশর

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব ॥ প্রাচীন মানব সভ্যতার দ্বিতীয় কেন্দ্র মিশর। এই ছোট দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। মিশরের উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে নিউবিয়ার মরুভূমি, পূর্বে লোহিত সাগর আর পশ্চিমে লিবিয়ার মরুভূমি। তুধারে সমুদ্র ও তুধারে মরুভূমি নিয়ে সেই প্রাচীন যুগেই মিশরে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। মিশরের আবহাওয়া গরম ও শুকনো। কিন্তু মিশরের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে নীলনদ। আর নীলনদের জন্যই মিশর আদি সভ্যতার জন্মভূমি হতে পেরেছে।

নীলনদ পৃথিবীর বড় বড় নদীর মধ্যে একটি—প্রায় চার হাজার মাইল দীর্ঘ। দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে।

গতিপথে অনেক ছোট-খাটো পাহাড় পড়েছে। সেই পাহাড়ের গা দিয়ে বইবার সময় সৃষ্টি হয়েছে জলপ্রপাত, ইংরেজিতে বলে ক্যাটারাক্ট। শেষ পাহাড় পেরিয়ে নীলনদের গতি অনেকটা

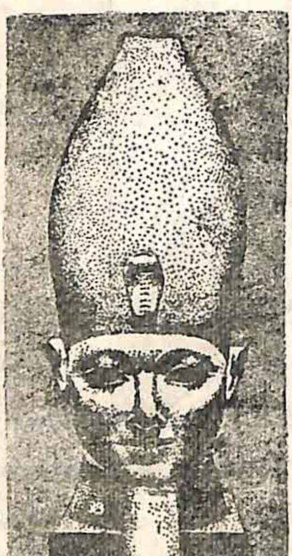


স্বচ্ছন্দ। বলতে গেলে এখান থেকেই নীলনদের জীবনের শুরু, মিশরের জীবনেরও শুরু। ভূমধ্যসাগরের কাছে এসে নীলনদ অনেকগুলি ছোট ছোট উপনদীতে ভেঙ্গে পড়েছে। তৈরি করেছে একটি ব-দ্বীপ।

প্রতি বছর বর্ষার পরে নীলনদের বন্যা আসত—বছরে একবার নির্দিষ্ট সময়ে। বন্যার ফলে মাটি নরম হয়ে চাষের কাজ সহজ করে দিত। তাই চাষবাসই হয়ে উঠল মিশরবাসীদের প্রধান

অবলম্বন। নীলনদের দুই তীরেই চাষ-আবাদ হত। চাষ হত গম, বার্লি ও ভুট্টা। ভালভাবে চাষ-আবাদের জন্য বন্যার জল নিয়ন্ত্রণের ও জলসেচের সুব্যবস্থা তারা করতে পেরেছিল।

চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম গড়ে উঠল। নীলনদের প্রভাবে মিশরের রাষ্ট্র ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি বিকাশলাভ করেছিল। বন্যার সময়ে সকলে মিলে কাজ করলে তবেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাই মিশর জুড়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা ছিল খুব বেশী। প্রয়োজনের তাগিদেই গোটা মিশর জুড়ে একটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল।


একজন ফেরায়ো

ফেরায়ো ॥ মিশরের রাজাকে 'ফেরায়ো' বলা হত। ফেরায়ো শব্দের অর্থহল 'বড় বাড়ীতে যিনি বাস করেন'। বড় বাড়ী বলতে নিশ্চয়ই রাজপ্রাসাদ বোঝাত। রাজার বাড়ী সাধারণ লোকের বাড়ীর থেকে অনেক বড় ছিল। ফেরায়ো মনে করতেন, তিনি ভগবানের প্রতিনিধি। প্রজারাও তাঁকে দেবতার মত সম্মান করত। ফেরায়োর মৃত্যুর পরেও যাতে তাঁর কষ্ট না হয়, তাই তাঁর কবরের মধ্যে থাকত তাঁর প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী, থাকত দাস-দাসী, পাত্র-মিত্র। প্রথমে দাস-দাসী বা পাত্র-মিত্রদের হয়ত জীবন্ত কবর দেওয়া হত। পরে তাদের

মূর্তি রাখা হত। প্রজারা মনে করত, রাজা কবরের মধ্যে থেকেও রাজ্যের মঙ্গলবিধান করেন।



কবরের মধ্যে নক্সা করা পাত্র

পুরোহিত।। পুরোহিতেরাও খুব প্রভাবশালী ছিল। তারা মন্দিরে থাকত। প্রচুর ধনসম্পদের মালিক তারা। তারা রাজাদের সাহায্য খুব পেত। রাজা তাদের জমি-জমা দিতেন। মিশরবাসীদের ধারণা ছিল, পুরোহিত দেবতাদের সঙ্গে কথা বলে। তাই তারা পুরোহিতদের তুষ্ট রাখত। শস্য, কাপড়, পশু, সোনা, রূপা প্রণামী দিত।

রাজার শক্তিবৃদ্ধিতে পুরোহিতদের বড় ভূমিকা ছিল। তারাই সাধারণ মানুষকে বোঝালো, ফেরায়ো হচ্ছেন দেবতার দূত, হয়তো দেবতা। তাঁর নির্দেশ মানতেই হবে। তাঁর কথা শুনলে দেবতা খুশী হবেন। এমনও বোঝানো হত, রাজার কবর যেন দেবতারই আশ্রয়স্থল। শিক্ষার দায়িত্ব পুরোহিতেরা পালন করত। মন্দিরের সঙ্গেই বিদ্যালয় থাকত।

কর আদায়কারী ও অন্যান্য কর্মচারী।। পুরোহিত ও রাজ-কর্মচারীদের সাহায্যে রাজা রাজ্য শাসন করতেন। রাজ্য কতকগুলি ভাগে বিভক্ত ছিল। রাজার প্রতিনিধিরূপে প্রধানরা এক একটি ভাগে শাসন করত। তাছাড়া, কর আদায়ের জন্য রাজকর্মচারী ছিল। চাষীর কত পশু, কতটা জমি, কতগুলি গাছ

আছে, তার হিসেব তারা রাখত। এই হিসেব অনুযায়ী কর দিতে হত। বাঁধের কাজের তদারকী করার জন্যও তাদের অধীনে অনেক



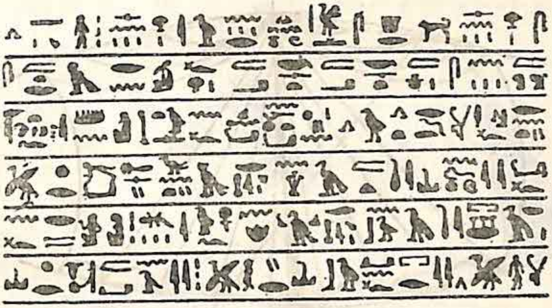
চাষীর উপরে 'নর্যাতন

কর্মচারী থাকত। নগদে বা দ্রব্যে কর দেওয়া যেত। সময়মত কর দিতে না পারলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

সৈন্য ও শ্রমিক ॥ রাজার অস্ত্রাগার ছিল, সেনাপতি ছিল, ছিল সৈন্যবাহিনী। চাষী, কারিগর, দাস—এরা প্রয়োজনে সকলেই যোদ্ধা।রাজার আদেশে সকলকেই যুদ্ধে যেতে হত। চাষী দিনরাত খেটে ফসল উৎপাদন করেছে, কারিগর হাতিয়ার তৈরি করছে, নানারকমের শিল্পকর্মে দক্ষতা দেখাচ্ছে, দাস শ্রম দিচ্ছে প্রাসাদ, মন্দির তৈরির কাজে। আবার তারাই যুদ্ধে যাচ্ছে। যারা চাষী ও মজুর তারাই সৈন্য, আবার যারা সৈন্য তারাই উৎপাদনে সাহায্য করছে।

লিপি ॥ হিসাবপত্র রাখার জন্যই মিশরে লিপির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। নীলনদের তীরে নলখাগড়ার মত দেখতে এক রকমের শণ জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাত। তার নাম 'পেপিরাস'। মিশরবাসীরা পেপিরাসের উপরে লিখত। ইংরেজী 'পেপার' শব্দটি 'পেপিরাস' থেকেই এসেছে। মিশরীয়রা একধরনের চিত্রলিপি ব্যবহার করত, যার নাম 'হায়ারোগ্লিফিক' লিপি। গোড়ার দিকে মিশরের লিপি ছিল পুরোপুরি চিত্রলিপি। একটি ছবি একটি শব্দের জন্য ব্যবহৃত হত। যেমন, জল বোঝাবার জন্য তারা

ঢেউ-এর ছবি আঁকত। মন্দিরের গায়ে, কবরের দেওয়ালে এরকমের অনেক চিত্রলিপি পাওয়া গেছে। পরের দিকে তারা



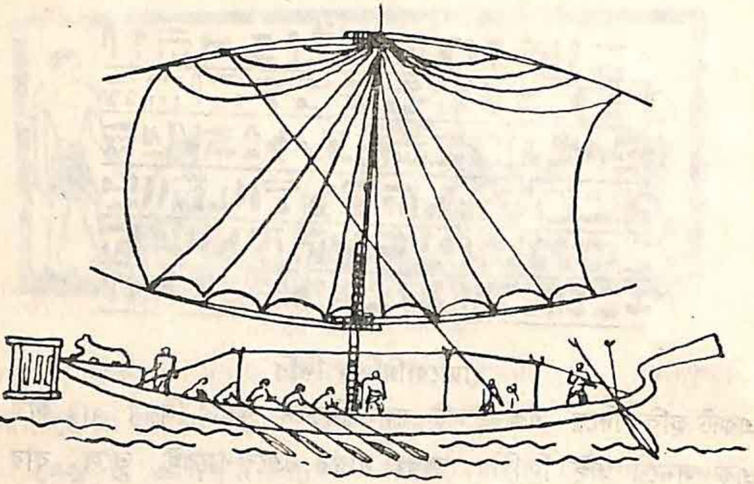
হায়ারোগ্লিফিক লিপি

একটি ছবি দিয়ে এক একটি ধ্বনি নির্দেশ করার নিয়ম বার করে। এক সময়ে এই লিপির কথা মানুষ একেবারেই ভুলে যায়। আধুনিক যুগে ফরাসী পণ্ডিত সামপোলিয় কুড়ি বছর চেষ্টা করে এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ মিশরে এত বেশী ফসল হত যে, নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও বাড়তি থাকত। আর এই বাড়তি ফসল মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করতে সাহায্য করে। মিশরের কারিগরেরাও বেশ দক্ষ ছিল। তাঁতী সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি করত মিশরের রঙিন কাঁচের জিনিসপত্রগুলি দেখতে খুব সুন্দর পাত্রে আঁকা থাকত নানারকমের নক্সা। তারা খুব সুন্দর চামড়ার জিনিসও বানাত। বিদেশের বাজারে এগুলির খুব কদর ছিল।

বিদেশের বাজারে এরকমের সব জিনিস বিক্রি হত। মিশর-বাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য বাণিজ্যের উপরে খুব নির্ভর করতে হত না। কিন্তু রাজাদের জাঁক-জমকের উপকরণ, পিরামিড, কবর, মন্দির সাজানোর জিনিসপত্র বিদেশের বাজার থেকেই আনতে হত। ভাল কাঠ, তামা, সোনা, মণিমুক্তা, দামী

পাথর, রঙ, সুগন্ধি দ্রব্য, মসলাপাতি, হাতির দাঁত বাইরে থেকে আমদানি হত। সুগন্ধি দ্রব্য আসত আরবদেশ থেকে। ভারতবর্ষ



পালতোলা নৌকা

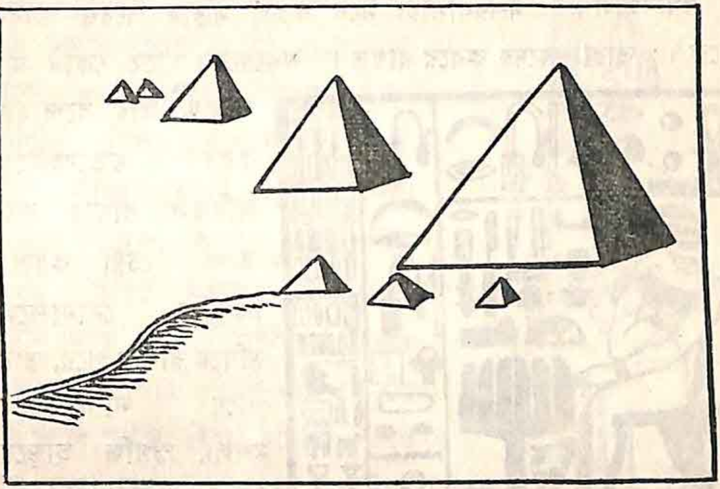
থেকে যেত মশলাপাতি। পালতোলা নৌকায় বাণিজ্য চলত। নাবিক ও বণিক শ্রেণীর সৃষ্টি হল।

পিরামিড ॥ মিশরবাসীরা মনে করত মৃত্যুর পরে আত্মা মৃতদেহের মধ্যে বাস করে। মৃতদেহ কবর দেওয়া হত, পাশে রাখা হত মৃতের নিজের জিনিসপত্র, পানীয় ও খাবারভর্তি পাত্র। প্রথম দিকে মৃতদেহকে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে কোনরকমে কবর দেওয়া হত। তারপরে শুরু হল সমাধি-সৌধ তৈরি করা। মিশরের রাজাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের সমাধি-সৌধ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এগুলিই হল বিখ্যাত পিরামিড। পিরামিডগুলি মৃত রাজাদের কবরের উপরে সমাধি-মন্দির।

চারকোণা ভিতের উপরে বড় বড় পাথর থাকে থাকে গেঁথে পিরামিড তৈরি হত। উপরের অংশ সরু, নীচের অংশ চওড়া। যে কোন দিক দিয়ে দেখলে পিরামিডকে ত্রিভুজের মত দেখায়।

এই পিরামিডগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ও উঁচু পিরামিডটি তৈরি

হয়েছিল কায়রোর কাছে। নীলনদের পশ্চিমে গিজেতে অবস্থিত এই পিরামিডটি রাজা কুফুর পিরামিড নামে বিখ্যাত। এর উচ্চতা



গিজের পিরামিড

৪৮১ ফুট। পিরামিডটি তৈরি করার জন্য মালপত্র টেনে উপরে তোলার পথটি হল ১০১৭ গজ লম্বা, ৬০ ফুট চওড়া। পথ তৈরি করতেই দশ বছর কেটে গিয়েছিল। আরও কুড়ি বছর লেগেছিল এই পিরামিড তৈরি করতে। এক একটি পাথরের ওজন প্রায় আড়াই টন। তাকে উপরে টেনে ঠিকমত বসাতে হত। তখন তো এখনকার মত টেনে তোলার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি। সবটাই করতে হত মানুষকে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। কত লোকের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফলে এমন সব ইমারত তৈরি হয়েছিল, তা তোমরা বুঝতেই পারছ।

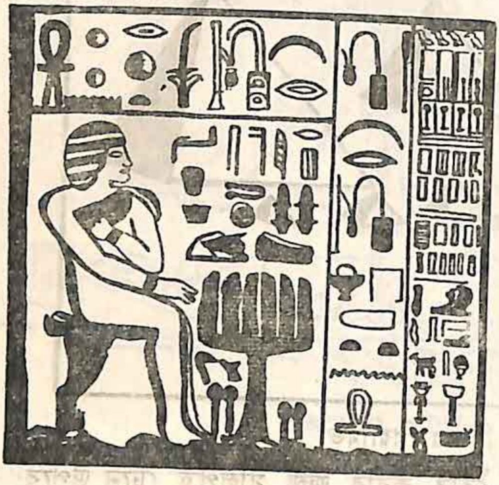


প্রাচীন মিশরের দেবদেবী

অবশ্য মনে রাখতে হবে, পিরামিডগুলি কারিগরী ও স্থপতি

বিদ্যার অপূর্ব সাক্ষী। রাজা সেনেফ্রুর তৈরি মাইহুমের পিরামিডটিও খুব সুন্দর।

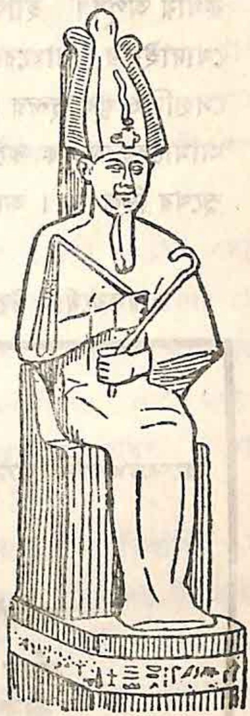
ধর্মবিশ্বাস।। মিশরবাসীরা মনে করত, মৃত্যুর পরেও জীবন থাকে। তারা শবদেহ কবরে রাখত। শবদেহের যাতে কোন কষ্ট না হয়, তার বন্দোবস্ত করত। মৃতদেহটিকে অবিকল রাখার জন্য তারা চেষ্টা করত। কিছুদিন নোনাজলে ডুবিয়ে রাখার পরে, তার গায়ে নানারকমের মশলা, সুগন্ধি ছড়িয়ে দিত। তারপরে তার গায়ে জড়িয়ে দিত পাতলা কাপড়ের ফালি। কাঠের বাক্সে করে সেটিকে কবর দেওয়া হত। ফলে শবদেহ নষ্ট হতে পারত না। এই শবদেহকে বলা হয় ম্যমি।


দেবতার আসরে নীলনদ

মিশরবাসীরা পশুপাখির মূর্তি গড়ে দেবতারূপে পূজা করত। অশুভ দেবতাকে বন্য, হিংস্র পশু রূপে তারা পূজা করত। পরে মানুষের চেহারায় পশু বা পাখির মাথা বসানোর রীতি চালু হয়েছিল। নীলনদ ছিল মিশরবাসীদের জীবন। তাই নীলনদকে তারা দেবতার মত পূজা করত।

মিশরবাসীদের সূর্য দেবতা, উর্বরতার দেবতা—ওসাইরিস। ওসাইরিসকে নিয়ে তাদের অনেক প্রবাদ কাহিনী আছে। ওসাইরিসের জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কাহিনী নিয়েই এই প্রবাদ। পুনর্জন্মের পরে ওসাইরিস মৃতের রাজ্যের রাজা হন। অন্যায়কারীর সাজা দেন। সৎলোককে আশীর্বাদ করেন। এই ধারণা থেকেই শবদেহকে কবরে অবিকৃত রাখার চেষ্টা হত মনে হয়।

অন্যান্য পেশা ॥ রাজা, পুরোহিত খুব জাঁকজমকের মধ্যে থাকলেও চাষীর অবস্থা খারাপ ছিল। অজন্মার সময়ে তাকে কর্জ নিতে হত। ঠিক সময়ে শোধ করতে না পারলে তাকে দাস করে নেওয়া হত। তারপরে ছিল বাধ্যতামূলক শ্রম, যাকে আমরা বেগার খাটুনি বলি। রাজার প্রাসাদ, কবর, সমাধি-সৌধ, মন্দির তৈরির কাজে এই রকমের খাটুনি দিতে হত। খাটুনির বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যেত না। কাজে অবহেলার শাস্তি ছিল কঠোর। চাষ করে যারা ফসল জন্মাতো, মাটিতে সোনা ফলাতো, খাজনার দায়ে, বেগার খাটুনির দায়ে তাদের জীবন দুঃখকষ্টে কাটত। দাসদের জীবন আরও খারাপ ছিল।



ওসাইরিস



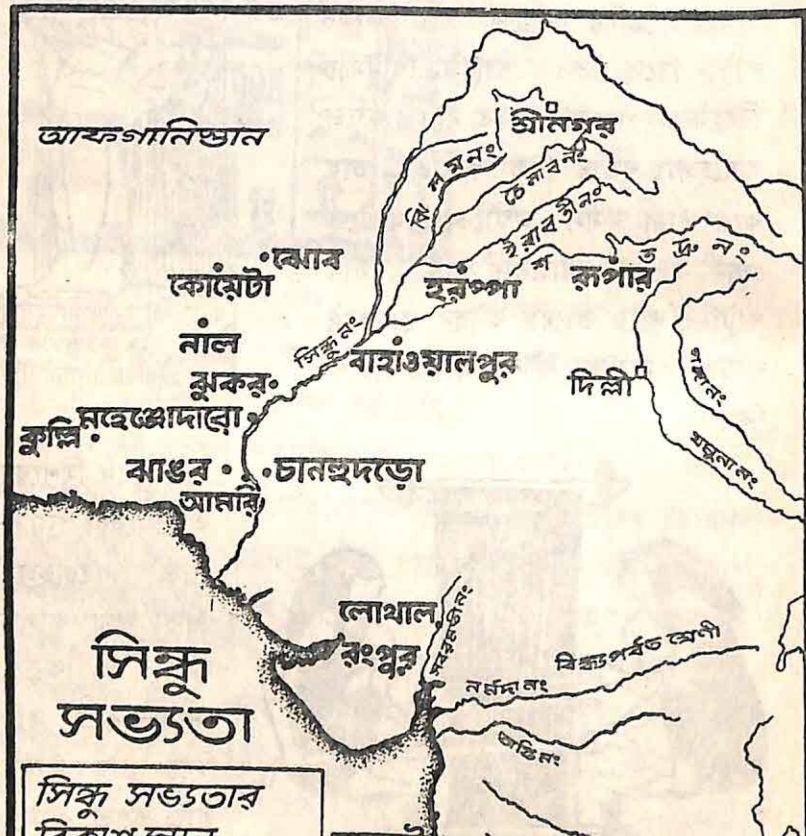
মেয়েরা তাঁত বুনছে

শিল্পকর্মে মিশরের কারিগরেরা খ্যাতি-লাভ করেছিল। তাঁতী সূক্ষ্ম কাপড় বুনত, রঙ করত, সোনা-রূপার তার দিয়ে তার উপরে কাজ করত। কুমোর সুন্দর মাটির পাত্র তৈরি করে নানা ধরনের নক্সা আঁকত। ধাতু ও কাঠের কাজে নিযুক্ত

কারিগরেরা খুব দক্ষ ছিল। তাদের তৈরি পালঙ্ক, খাট, টেবিল এক কথায় অপূর্ব। হাতির দাঁতের কারুকার্য করা হত সেগুলির উপরে। খোদাইকর পাথরের উপরে খোদাই করে যে সব মূর্তি আঁকত, সেগুলিও খুব সুন্দর। সোনা-রূপা, মণি-মুক্তার অলঙ্কারগুলি এখনও আমাদের অবাক করে। কিন্তু এত পরিশ্রম করেও তাদের জীবন সুখের ছিল না। অনেকের ভাগ্যে দুবেলা দুমুঠো খাবারও জুটত না।

সিন্ধু উপত্যকা

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুনদের বিরাট উপত্যকা জুড়ে



আর একটি সুপ্রাচীন নগর-সভ্যতা বিকাশলাভ করেছিল। এই

সভ্যতা শুধুমাত্র সিন্ধুনদের উপত্যকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমে বেলুচিস্তানেও এই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। সিন্ধুনদের পূর্বদিকেও কোন কোন জায়গায় এই সভ্যতার কিছু সন্ধান পাওয়া গেছে। সিন্ধু-সভ্যতা মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতার সমকালীন। তবে সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তৃতি ছিল অনেক বেশী অঞ্চল জুড়ে।

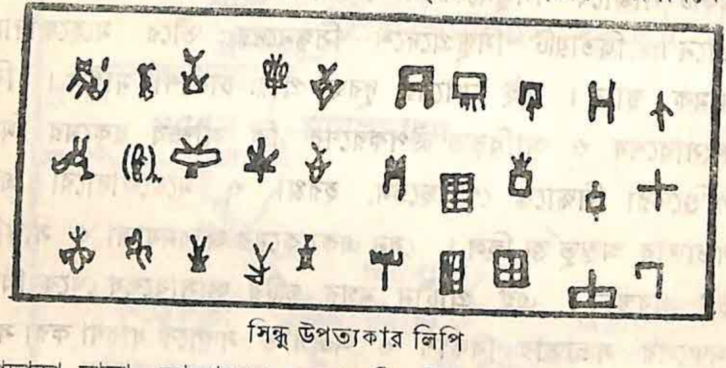
সিন্ধু উপত্যকার বিস্তৃত অঞ্চলে অনেকগুলি প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব বসতি খুঁড়ে পাওয়া গেছে মানুষের প্রয়োজনীয় অনেক উপকরণ, খেলনা, শীলমোহর। সেগুলির মধ্যে দেখা যায় অদ্ভুত রকমের মিল। তাতে মনে হয়, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ একই সভ্যতার ধারক। তাদের জীবন যাপনের ধারার মধ্যে নিশ্চয়ই মিল ছিল।

আবিষ্কারের কাহিনী ॥ প্রাচীনকালের বসতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় বসতি দুটি আবিষ্কৃত হয়েছে সিন্ধুনদের উপত্যকায়। একটি পাঞ্জাবে—সিন্ধুনদের শাখা ইরাবতী নদীর তীরে হরপ্পা নামক স্থানে। দ্বিতীয়টি সিন্ধুপ্রদেশে—সিন্ধুনদের তীরে মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে। দুই নগরের দূরত্ব প্রায় চারশো মাইল। কিন্তু ধ্বংসাবশেষ ও আবিষ্কৃত উপকরণের কি আশ্চর্য রকমের মিল। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো একই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেন একরকমের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির দুই অবস্থান। এই প্রাচীন নগর দুটির ধ্বংসাবশেষ থেকে বিস্তৃত অঞ্চলের সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। তাই সিন্ধুনদের অববাহিকা ছাড়িয়েও যে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল, তাকে সিন্ধু-সভ্যতা বলা হয়। বর্তমানে এই সভ্যতাকে হরপ্পা-সভ্যতা বলেও উল্লেখ করা হয়।

কেমন করে এই সুপ্রাচীন সভ্যতার আবিষ্কার হল? কেমন করে আমরা জেনেছি যে, খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিনহাজার বছর আগে

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে বিশাল উঁচু উঁচু অনেকগুলি মাটির ঢিবি ছিল। বহুদিন ধরেই ঢিবিগুলি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনে করলেন যে, এসব ঢিবিগুলির নীচে হয়তো কোন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। শুরু হয় খননের কাজ। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত দয়ারাম সাহনি হরপ্পাতে খননের কাজ শুরু করেন। তার পরের বছর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় খননের কাজ আরম্ভ করেন মহেঞ্জোদারোতে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে যে সভ্যতার অস্তিত্বের আবিষ্কার হয়েছে, তা কোন বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ নয়। আবিষ্কৃত হয়েছে এক প্রাচীন নগর-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ।

খননের ফলে যে সব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে, তার মধ্যে রয়েছে মাটির নানারকমের খেলনা, পাথর, তামা ও ব্রোঞ্জের বিভিন্ন হাতিয়ার। আরও পাওয়া গেছে পুরানো শহরের ধ্বংসাবশেষ।



সিন্ধু উপত্যকার লিপি

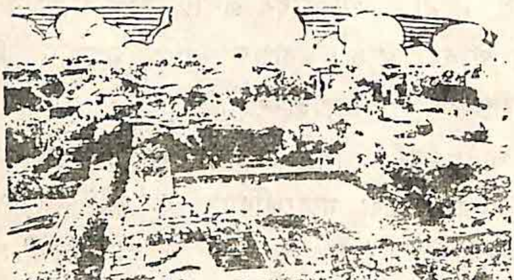
তাছাড়া নানা আকারের কতকগুলি শীলমোহরও পাওয়া গেছে। শীলমোহরের গায়ে যেমন জীব-জন্তু, বৃক্ষ ও দেবতার চিত্র আছে, তেমন আছে একরকমের অজানা চিত্রলিপি। সিন্ধু-সভ্যতার লিপি এখনও পাঠ করা যায় নি। যেদিন এ লিপির পাঠোদ্ধার করা যাবে, সেদিন এ সভ্যতার অনেক নতুন তথ্য জানতে পারা যাবে।

বর্তমানে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিক কালে খননকার্যের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনের অনুরূপ আবিষ্কার হয়েছে। গুজরাটের রংপুর, লোথাল প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গেছে ভাঙ্গা বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, স্নানের ঘর, নর্দমা। পাঞ্জাবের রূপার অঞ্চলে মাটির নানারকমের জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। রাজস্থানের কালিবঙ্গানে সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনের অনুরূপ আবিষ্কার হয়েছে।

নগর পরিকল্পনা॥ সিন্ধু সভ্যতা নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো এ দুটি নগরই ছিল ভারি সুন্দর সাজানো। মনে হয় সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরি। রাস্তাগুলি ছিল চওড়া ও সোজা। বাড়িগুলি তৈরি হত পোড়া ইঁট দিয়ে। কোথাও পাথরের ব্যবহার হয় নি। দোতলা বাড়ীর সংখ্যাই বেশী। কোন কোন বাড়ী ছিল আরও উঁচু। দরজা, জানালা, সিঁড়ি, মেঝে, উঠোন এগুলি দেখে তখনকার মানুষের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। প্রত্যেকটি বাড়িতে পাতকুয়া, স্নানের ঘর, জল নিকাশের বন্দোবস্ত থাকত। বড় বড় বাড়িগুলি ছিল বড় রাস্তার ধারে। গলির মধ্যে ছোট ছোট বাড়ি ছিল। ছোট ছোট ঘর নিয়ে তৈরি একমাপের কতকগুলি বাড়ি ছিল। সরু গলিগুলি সোজা এসে বড় রাস্তায় মিশত। সরু রাস্তার ধারে সকলের ব্যবহারের জন্য পাতকুয়া ছিল।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে সর্বত্র জল নিকাশের সুব্যবস্থা দেখলে অবাক হতে হয়। বাড়ির নর্দমাগুলি রাস্তার বড় নর্দমাগুলির সঙ্গে মিশত। রাস্তার নীচে দিয়ে নর্দমাগুলি তৈরি হয়েছিল। আবর্জনা ফেলার জন্য আধুনিক কালের মত ডাস্টবিনও থাকত। রাতে পথে বাতি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। নগরের পরিকল্পনা, রাস্তাঘাট ও জল নিকাশের ব্যবস্থা দেখলে মনে হয় তখন সুনিয়ন্ত্রিত পৌরশাসন ব্যবস্থা বর্তমান ছিল।

মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত একটি বিশাল স্নানাগার আর এক বিস্ময়ের বস্তু। এই স্নানাগারের মাঝখানে ছিল একটি জলাধার। সেখানে নগরবাসীরা স্নান করত, সাঁতার কাটত। জলাধারটি জলে ভর্তি করার ও আবার সেই জল নিকাশ করবার ব্যবস্থা ছিল।



মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার

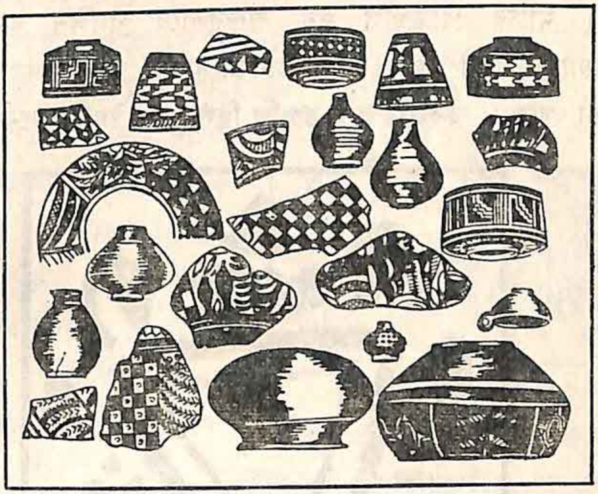
লোকজনের বসার জন্য চারিদিকে গ্যালারি ছিল। স্নান করার আগে ও পরে জামাকাপড় বদলাবার জন্য ঘর ছিল। আধুনিক কালের 'সুইমিং পুল'-এর মত সব ব্যবস্থা দেখলে অবাক হতেই হয়।

হরপ্পাতে মস্ত এক বাড়ীর সন্ধান মিলেছে। খুব সম্ভবত এটা শস্যভাণ্ডার ছিল। শস্য মজুত রাখার জন্য এবং প্রয়োজনে খাবার-দাবার সরবরাহের জন্য দুটি নগরেই বড় বড় শস্যভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে।

নগর দুটির সুরক্ষার জন্য উঁচু চওড়া পাঁচিল ছিল। তার মাঝে মাঝে রক্ষীদের পাহারা দেওয়ার স্থান নির্দিষ্ট থাকত। নগরের বাইরে কারিগর ও শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা ছিল।

খাদ্য ও ব্যবহারের জিনিসপত্র॥ এখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল গম, যব, খেজুর, মাংস, মাছ, ডিম, দুধ ইত্যাদি। উর্বর জমিতে গম, যব প্রচুর পরিমাণে ফলত। তাই খাবার নিয়ে তাদের চিন্তা ছিল না। তিল, সরষে ইত্যাদির চাষও হত।

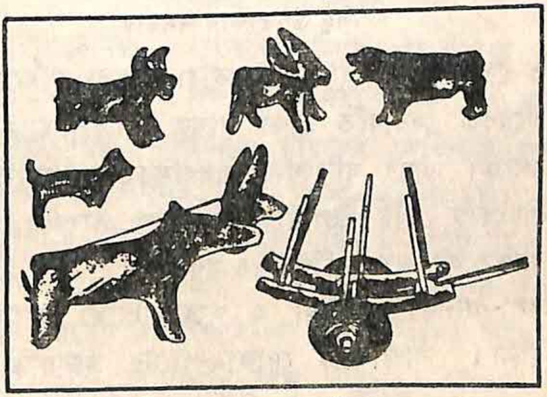
এখানকার মানুষেরা সরষের তেলের ব্যবহার জানত। কার্পাস তুলারও চাষ হত। ঘরের কাজে মাটির পাত্রের ব্যবহার ছিল।



সিন্ধু উপত্যকার মাটির বাসনপত্র

কুড়ুল, ছুরি, করাত, কাস্তে ইত্যাদি তামা বা ব্রোঞ্জে তৈরি হত। হাড় বা হাতির দাঁতের চিরুনি ও সূঁচ, মাছ ধরার বড়শি প্রভৃতি জিনিসও পাওয়া গেছে।

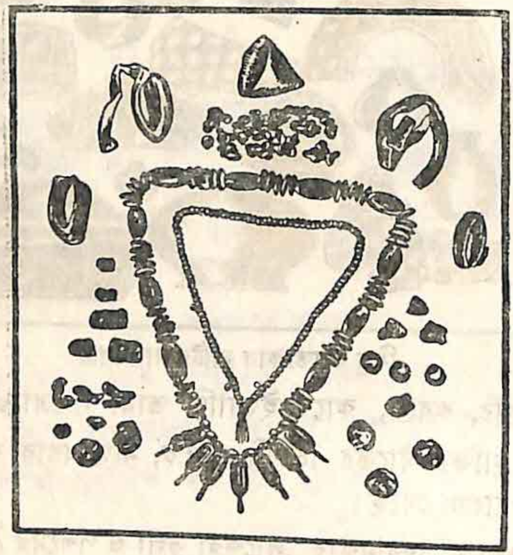
শিল্পকলা॥ এখানকার লোকেরা তুলা ও পশমের তৈরি পোষাক



মাটির তৈরি খেলনা ও চাকাগাড়ীর ভগ্নাবশেষ

পরত। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই গহনা পরতে ভালবাসত। সোনা,

রূপা, দামী ও কম দামী পাথরের বহু অলঙ্কার তাই পাওয়া গেছে। কুমোর, কামার, ছুতোর, তাঁতী, স্বর্ণকার সকলেই নিজের কাজে দক্ষ ছিল। মাটির পাত্রগুলি খুব সুন্দরভাবে পালিশ করা হত। হাতিয়ারের মধ্যে ছোরা, ছুরি, করাত, কাস্তে আর কুড়ুলের সন্ধান পাওয়া গেছে। হরপ্পার করাতগুলি ছিল বেশ উন্নত ধরনের।

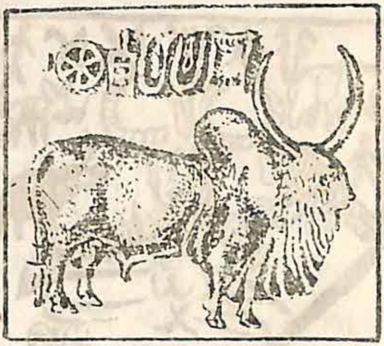


সিন্ধু উপত্যকার অলঙ্কার

মূর্তি তৈরি করার ব্যাপারেও তারা দক্ষতা দেখিয়েছে। ছোট ছোট কয়েকটি দেবীমূর্তি ছাড়া পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব মূর্তিগুলি শিল্পরসিকদের প্রশংসা পেয়েছে। চারকোণা ছোট ছোট শীলমোহরও অনেক পাওয়া গেছে। তার উপরে অঙ্কিত জীবজন্তুর মূর্তিগুলিও খুব সুন্দর।

ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। রাস্তাঘাটে দোকান-পাটের ছড়াছড়ি। কামার, ছুতোর, কুমোর, তাঁতী যেসব জিনিস তৈরি করত, সেগুলি শুধু দেশের বাজারে বিক্রী হত না। বিদেশেও চালান যেত। বিদেশ

থেকে দরকারী জিনিসপত্র আমদানি করা হত। টিন, সোনা, দামী পাথর আমদানি করা হত। হিমালয় অঞ্চল থেকে কাঠ আসত। আরব সাগর থেকে আসত মাছ। এখানকার নক্সাকাটা মাটির পাত্র, শীলমোহর সুমেরে পাওয়া গেছে। আবার সুমেরের জিনিস-পত্র এখানে পাওয়া গেছে। শীলমোহরগুলি বোধ হয় প্রধানত ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। দক্ষিণ ভারত, আফগানিস্তান, পারস্যের সঙ্গে এখানকার মানুষের ব্যবসায়ের জন্য যোগাযোগ ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় প্রচুর তুলার চাষ হত। বিদেশের বাজারে এখানকার সূতীর কাপড়ের কদর ছিল।


মহেঞ্জোদারোর শীলমোহর

জলপথে স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। গুজরাটের লোথালে একটি বন্দর আবিষ্কৃত হয়েছে। নৌবাণিজ্যের প্রচলন ছিল—এ বন্দরটি তার প্রমাণ। স্থলপথে উট ও দুচাকার গাড়িতে জিনিসপত্র নেওয়া হত। বণিকেরা প্রভাবশালী ও সমৃদ্ধশালী ছিল।

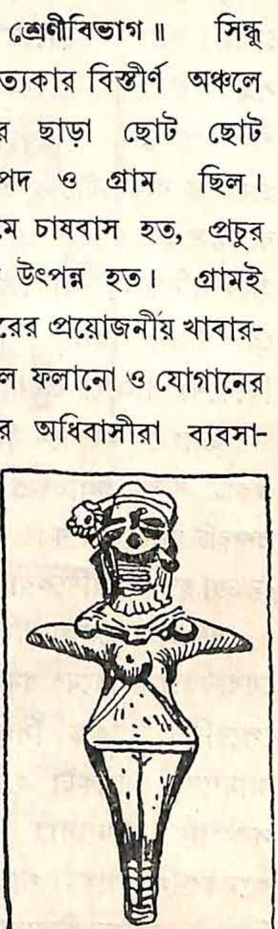
ধর্ম ॥ মেসোপটেমিয়া ও মিশরের লিপি পাঠ করতে পারায় সেখানকার মানুষের ধর্মজীবন সম্পর্কে আমরা অনেক কথা জানতে পেরেছি। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকার মানুষের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। গাছ, পশুপাখি, নদীনালার উপাসনা প্রচলিত ছিল। শিবলিঙ্গের মত অনেকগুলি পাথর পাওয়া গেছে। মনে হয়, লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। তাছাড়া শীলমোহরের উপরে এক ত্রিমূর্তি বিশিষ্ট প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। তিনি যোগাসনে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে একটি হাতি, একটি বাঘ, একটি গণ্ডার ও একটি মোষ। সম্ভবত ইনি পশুপতি শিব। এখানে আরও পাওয়া গেছে মাটি ও

পাথরের তৈরি অসংখ্য নারীমূর্তি। এই মূর্তিগুলি দেখে মনে হয়, পূজা-উপাসনার জন্যই এগুলির ব্যবহার ছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন, সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা দেবী মাতৃকার আরাধনা করত।



পশুপতি শিব

শ্রেণীবিভাগ ॥ সিন্ধু উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নগর ছাড়া ছোট ছোট জনপদ ও গ্রাম ছিল। গ্রামে চাষবাস হত, প্রচুর শস্য উৎপন্ন হত। গ্রামই নগরের প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার যোগান দিত। চাষীদের উপর ফসল ফলানো ও যোগানের দায়িত্ব ছিল বলে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পকর্মে আত্ম-নিয়োগ করতে পেরেছিল। নগর ছুটি ঘন-বসতিপূর্ণ ছিল। নগরে বাস করত শাসক, পুরোহিত, বণিক, দোকান-দারেরা। নগর-সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে সমাজে শ্রেণীভেদ ছিল। ধনসম্পদের বেশির ভাগ অভিজাতশ্রেণীর হাতে ছিল। তারা যথেষ্ট বিলাসের মধ্যে জীবন কাটাত। তাদের বাড়ীগুলি ছিল প্রাসাদেরই মত। তার মধ্যে থাকত সবরকমের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা। রান্নাঘর, স্নানের ঘর, সুন্দর জল নিকাশের ব্যবস্থা, কি ছিল না সে বাড়ীগুলিতে। বাড়ীগুলির কোনটা দোতলা, কোনটা



নারীমূর্তি

তার থেকেও উঁচু। মাটি খোঁড়ার পরে এই বড় বড় বাড়ীগুলি থেকেই পাওয়া গেছে সুদৃশ্য পাত্র, দামী অলঙ্কার, আরও কত কি! কেন্দ্রীয় শস্যাগার, কেন্দ্রীয় ভাবে শস্য পেষাই-এর ব্যবস্থা—সবের উপরে ঐ বড় বড় বাড়ীর বসিন্দাদেরই কর্তৃত্ব ছিল। তারা ছিল রীতিমত ধনী। কারিগরদের অবস্থা ভাল ছিল না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের থাকতে হত শহরের উপকণ্ঠে। শহরের মধ্যে যারা থাকত, তাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল ব্যারাকের মত বাড়ীগুলিতে। অনেক ছোট ছোট ঘর নিয়ে বিশাল লম্বা—তার মধ্যে থাকতে হত একসঙ্গে অনেককে। জানালা দরজা বেশি থাকত না—আলো হাওয়া কম। বসবাসের সুযোগ-সুবিধাও খুব কম ছিল। শিল্পকর্মে নিপুণ করিগরেরা এমন জীবনই যাপন করত।

২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা চরম উন্নতি লাভ করেছিল। কেমন করে এই সভ্যতার ধ্বংস হল সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। হয়তো কোন আকস্মিক বন্যায়, অথবা, কোন বিদেশী আক্রমণের তাণ্ডবে এই সভ্যতার পতন ঘটে।

চীন

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব।। এশিয়া মহাদেশের পুবদিক জুড়ে বিশাল চীনদেশ। চীনদেশের মধ্য দিয়ে দুটি বড় নদী বয়ে পুবদিকের সমুদ্রে পড়েছে। নদী দুটির নাম হোয়াংহো এবং ইয়াংসি-কিয়াং। হোয়াংহোর উপত্যকা জুড়ে বিরাট সমতলভূমি। ইয়াংসি-কিয়াং নদীর পথে রয়েছে কিছু পাহাড়ী অঞ্চল, ঘন জঙ্গল, আবার কতকটা সমতলভূমি। এই দুই নদীর উপত্যকায় প্রাচীনকালেই সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল।

নদী দুটির সমতল উপত্যকা খুব উর্বর। হোয়াংহো নদীর তীরবর্তী ভূমির উর্বরতা তুলনায় অনেকটা বেশি ছিল। নদীর

তীরের মাটি নরম, পলিতে ভরা, রঙ হলদে। নরম মাটি থাকায় নদীর জল বাড়লে চারদিক ভেসে যেত খুব সহজে। কিন্তু হলদে মাটি জমিকে আরও উর্বর করত। তাই নদীর আশেপাশেই



মানুষের বসবাস আরম্ভ হয়েছিল। মাঝে মাঝেই হোয়াংহোর বন্যা সব ভাসিয়ে নিত। তাই হোয়াংহোকে বলা হয়েছে 'চীনের দুঃখ' বা 'হাজার দুঃখের নদী'।

কিন্তু জমির উর্বরতার জন্যই সেখান থেকে মানুষ সরে যেতে পারেনি। তারা নদীতে বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করেছিল।

চাষবাসের দ্রুত উন্নতি দেখা দিল। চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের উদ্ভব হল। বড় ও সমৃদ্ধ হয়ে কতকগুলি গ্রামের শহরে পরিণত হতে খুব দেরি হয় নি।

ব্রোঞ্জের ব্যবহারের আগে চীনবাসীরা পাথর ও হাড় দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করত। পাথরের ধারালো ছুরি ও কুঠার, হাড় দিয়ে তীরের ফলা বানানোর অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারা ঝিনুকের গয়না পরত, ভেড়া, শুয়োর ও কুকুর পুষত। কালো রঙের মাটির পাত্র তৈরির কাজেও তারা যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। ধাতুর ব্যবহার জানতে পেরে তারা ব্রোঞ্জ দিয়েই হাতিয়ার তৈরি করত। ব্রোঞ্জের কারুকার্য করা জিনিসপত্র তৈরিতেও তারা বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিল।

উপকথা॥ চীনের প্রাচীন উপকথায় অনেক গল্প আছে। এমন একটি কাহিনী পৃথিবীর জন্ম নিয়ে। আঠারো হাজার বছরের ঘুম থেকে জেগে প্রথম মানুষ পান-কু চারদিকে অন্ধকার ও অরাজকতা দেখলেন। রাগে হাত ছুড়লেন। অরাজকতা দূর হল। প্রকৃতির যা কিছু বিশুদ্ধ তা জেগে উঠল। আবার হাত ছুড়লেন—আকাশ ও পৃথিবী আলাদা হয়ে গেল। এবার পান-কু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার উপরে আকাশ। একদিন যায়, পৃথিবীর মাটি দশ ফুট ঘন হয়, আকাশ উঠে যায় দশ ফুট, পান-কুর উচ্চতাও বাড়ে দশ ফুট। এমনি করে কেটে গেল আবার আঠারো হাজার বছর। পৃথিবীর মাটি শক্ত হল, আকাশ অনেক উপরে। এভাবেই আকাশ ও পৃথিবীর রূপ তিনি দিলেন।

পান-কু মারা গেলেন। মৃত্যুর পরে পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার কাজে লাগলেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বাতাস ও মেঘ সৃষ্টি হল, কণ্ঠস্বর থেকে জন্ম নিল বজ্র। সূর্য ও চন্দ্র এল তাঁর চোখ দুটি থেকে, চুল-দাড়ি নক্ষত্রে রূপ নিল। রক্ত থেকে জন্ম নিল নদীর জল। দেহের মাংস হল মাঠের উর্বর জমি। দাঁত ও হাড় মাটির নীচের মূল্যবান ধাতুতে পরিণত হল।

কিন্তু মানুষ? দেবী নু-কুয়া মাটির তাল দিয়ে মানুষ তৈরি করলেন, একটা নয়, অনেক।

বন্যার জল রোধ করে চাষবাসের সুবিধা হল কেমন করে, তাই নিয়েও উপকথা আছে। স্বর্গের রাজা পীতসম্রাট মানুষের অন্যায়ে রেগে জলদেবতাকে গোটা পৃথিবীটাকে ভাসিয়ে দিতে বললেন। শুরু হল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। মানুষ ঘরে আটকে পড়ল, তাদের খাদ্য নষ্ট হয়ে গেল। ঘরেও থাকা গেল না আর। জলের চাপে নদীর তীর ভাঙল, সব ভেসে ছারখার হয়ে গেল। অনেক মানুষ মরল, কেউ কেউ বেঁচে থাকল অনেক কষ্টে।

মানুষের দুঃখে ব্যথা পেলেন পীতসম্রাটের নাতি কুন্। দাদুর যাদুদণ্ড চুরি করে তিনি পৃথিবীতে নামলেন। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে যাদুদণ্ডকে কাজে লাগালেন। জল কমতে লাগল, জেগে উঠল উর্বর শুকনো মাটি। পাহাড়ের গুহার আশ্রয় থেকে মানুষ আনন্দে বেরিয়ে এল। কুন্ যাদুদণ্ড দিয়ে বাঁধ তৈরি করলেন, বাঁধের ধার ঘেঁষে নতুন উর্বর জমি সৃষ্টি করলেন। কিন্তু পীত সম্রাট কুন্‌কে হত্যা করিয়ে যাদুদণ্ড ফিরিয়ে নিলেন। কুন্-এর ছেলে য়ু পীতসম্রাটকে সন্তুষ্ট করে আবার যাদুদণ্ড পেয়েছিলেন। তিরিশ বছর ধরে তিনি পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কুন্-এর অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন।

এই উপকথার ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। কিন্তু হোয়াংহোর বন্যার ফলে চীনবাসীদের দুঃখকষ্ট আর সেই বন্যা প্রতিরোধের জন্য তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এমন উপকথার যে সৃষ্টি করে নি, তা কে বলতে পারে?

নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার থেকে খ্রীস্টপূর্ব দেড় হাজার বছরের মধ্যে মানব সভ্যতার অগ্রগতির কাহিনীকে আমরা সভ্যতার আদিকাল বলেছি। নদীর তীর ধরে এই সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। তাই আমরা তাকে নদী-সভ্যতা বলতে পারি।

নগর ছিল নদী-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। গ্রাম থেকে কেমন করে কতকগুলি নগরের উদ্ভব হয়েছিল, সে কাহিনী তোমাদের অজানা নয়। যে সব দেশে নদী-সভ্যতার জন্ম, সেখানে নগর-বিপ্লবের চেহারাটাও মোটামুটিভাবে এক ধরনের। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কিছু অমিল নিশ্চয়ই ছিল। যেমন ধর, মাটির বাসনপত্র। মাটির বাসনপত্র সব দেশেই তৈরি হত। তার উপরে নানারকমের নক্শাও আঁকা হত। কিন্তু তৈরি করার ধরন বা নক্শার কারুকার্যে পার্থক্য ছিল। সব দেশের কারিগরেরাই দক্ষ। কিন্তু তাদের কাজে অনেক তফাৎ। এ রকমের কিছু পার্থক্য থাকলেও নদী-সভ্যতার চরিত্রে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

নদী-সভ্যতার অঞ্চলগুলি পলিমাটির অঞ্চল। ভূমি খুব উর্বর। ফসল উৎপাদনের সুবিধা ও প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। গম, যব, বার্লি প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে ফলত। সিন্ধু উপত্যকায় ও চীনে আবার ধানও উৎপন্ন হত। চাষবাস হয়ে দাঁড়াল এখানকার মানুষের প্রধান উপজীবিকা।

কিন্তু প্রায়ই বন্যা এসে ভাসিয়ে দিত মানুষের বহু যত্ন ও পরিশ্রমের ফল। তাই এসব দেশের মানুষকে প্রথম থেকে লড়াই করতে হল বন্যার সঙ্গে। বাঁধ তৈরি হল। খরার সময়ে জলের অভাব মেটাতে তারা পাতকুয়া বা হ্রদ কাটল। খাল কেটে জমিতে জল নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও তারা করেছিল। এসব কাজে পরিশ্রম, শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। তারা একসঙ্গে থাকতে শিখল, ঘরবাড়ী তৈরি করে জমির কাছেই বাসা বাঁধল। এভাবে গ্রামের সৃষ্টি হল।

জোটবদ্ধভাবে পরিশ্রমের ফলে উৎপাদন বাড়ল। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও শস্য এখন অনেকটা উদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্ত ফসলই নগর-বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত করে। সমৃদ্ধ গ্রাম ধীরে ধীরে নগরে পরিণত হল। দেখা দিল বণিক-ব্যবসায়ী, হিসাবরক্ষক, পুরোহিত ও রাজা। আরও সৃষ্টি হল কারিগর, শ্রমিক শ্রেণী। তারা

নগর-সভ্যতার সৃষ্টি করে। তারা কেউ চাষবাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। তাদের খাদ্য যোগানের দায়িত্ব ছিল চাষীদের উপরে।

উদ্বৃত্ত ফসলের বিনিময়ে নানা দেশ থেকে নগর-সভ্যতার প্রয়োজনীয় উপকরণ আনা হত। পাথর, কাঠ, তামা, টিন ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু এই অঞ্চলগুলিতে বেশি পাওয়া যেত না। তাই এক শ্রেণীর লোক এসব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগান দিত। বণিক ও ব্যবসায়ীরা এ ধরনের কাজে নিযুক্ত হল।

মালপত্র বইবার জন্য চাকার গাড়ী, পালতোলা নৌকার ব্যবহার আরম্ভ হল। সুমের, মিশর ও সিন্ধু উপত্যকায় চাকার গাড়ী ও নৌকার ব্যবহারের অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। জিনিসপত্রের দেয়া-নেয়া করতে গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হল। নদী-সভ্যতার দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

পাথর, কাঠ ও অন্যান্য ধাতু দিয়ে কাজ করবে কারা? দেখা দিল দক্ষ কারিগর। ছুতোর কাঠের কাজে, খোদাইকর পাথরের কাজে, কামার ও স্বর্ণকার ধাতুর কাজে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। কারিগরেরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকত। চাষবাসের সঙ্গে তারা যুক্ত ছিল না। পেশার ভিত্তিতে সমাজে ভাগ দেখা দিল।

দামী কাঠ, পাথর, সোনা, রূপা আমদানি বা মজুত করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমাজের কিছু কিছু লোক ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হয়ে উঠল। উদ্বৃত্ত ফসল সমাজে এভাবে এক শ্রেণীর সুবিধাভোগীর সৃষ্টি করল। তাদের মধ্যে আছে অভিজাত ধনী, বণিক, পুরোহিত ও সকলের উপরে রাজা। অভিজাত ধনীরা বিলাসের মধ্যে জীবন কাটাত। পুরোহিতেরা ধনী ও শক্তিশালী ছিল। রাজা সকলের উপরে। তিনি সব কিছুর মালিক। সুমেরের রাজা, মিশরের 'ফেরায়ো' কি অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তা আমরা জেনেছি। সুমেরের জিগুরাট, মিশরের রাজাদের

কবর ও পিরামিড প্রমাণ করে পুরোহিত ও রাজার প্রভাব প্রতিপত্তি কতখানি ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে ফলে হিসাবরক্ষার প্রয়োজন দেখা দিল। সুমেরের বাণমুখ লিপি, মিশরের চিত্রলিপি ও সিন্ধুসভ্যতার লিপির ইতিহাস তো আমাদের জানা। লিপি সহজবোধ্য ছিল না। এখানে লেখা পড়া জানা এক বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হল। শিক্ষার ব্যাপারেও পুরোহিতদের কর্তৃত্ব ছিল। মন্দিরেই শিক্ষা দেওয়া হত।

এভাবে নদী-সভ্যতার জন্মভূমিগুলিতে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে। নগর-বিপ্লব সর্বত্র একসময়ে না হলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রেখে একভাবেই এসেছিল। এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের যোগাযোগ, উপকরণের আদান-প্রদান ও ভাব-বিনিময় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আরও পুষ্ট করেছে।

অনুশীলনী

মেসোপটেমিয়া

১। **দুই এক কথায় উত্তর দাও ঃ—**

(ক) মেসোপটেমিয়া নামটি কাদের দেওয়া ? দেশটি কোথায় ?

(খ) মেসোপটেমিয়ার কোন অংশে সুপ্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল ?

(গ) জিগুরাট কাকে বলে ?

(ঘ) কিউনিফর্ম লিপি দেখতে কেমন ছিল ?

২। **উত্তর দাও ঃ—**

(ক) সুমেরের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আমরা কেমন করে জানতে পেরেছি ?

(খ) সুমেরবাসারা বন্যার জল নিয়ন্ত্রণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ?

(গ) সুমেরবাসীরা চাষবাসের কাজ কেমন করে করত ?

(ঘ) সুমেরবাসীদের প্রধান প্রধান জীবিকা সম্পর্কে কি জান ?

(ঙ) পুরোহিতদের ক্ষমতা কেমন ছিল ?

(চ) সুমেরের মন্দিরগুলির গঠনশৈলী সম্পর্কে কি জান ?

(ছ) সুমেরের প্রধান যানবাহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কি জান ?

(জ) সুমেরে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল কেন ? কিউনিফর্ম লিপি সম্পর্কে কি জান ?

মিশর

১। দুই এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) মিশরের মধ্য দিয়ে কোন নদী বয়ে গিয়ে কোথায় পড়েছে ?

(খ) ফেরায়ো কাকে বলা হত ?

(গ) পেপিরাস কি ? কি কাজে পেপিরাস ব্যবহৃত হত ?

(ঘ) কোন ফেরায়ো সবচেয়ে বড় পিরামিডটি কোথায় নির্মাণ করিয়েছিলেন ?

(ঙ) মাইদুমের পিরামিডের নির্মাতা কে ?

২। উত্তর দাও :—

(ক) নীলনদের বন্যাকে কেমন করে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল ? তার ফল কি হয়েছিল ?

(খ) ফেরায়ো কি রকম ক্ষমতা ভোগ করতেন ?

(গ) মিশরে পুরোহিতদের অবস্থা কেমন ছিল ? তারা কিভাবে ফেরোয়াকে সাহায্য করত ?

(ঘ) মিশরে কৃষক, কারিগর ও দাসদের অবস্থা কেমন ছিল ?

(ঙ) মিশরের লিপি সম্পর্কে কি জান ?

(চ) অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিশরবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কি জান ?

(ছ) পিরামিড কাকে বলে ? সবচেয়ে বড় পিরামিড সম্পর্কে কি জান ? যাদের শ্রমে পিরামিড তৈরি হত, তাদের অবস্থা কেমন ছিল ?

(জ) মিশরবাসীদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কি জান ?

সিন্ধু উপত্যকা

উত্তর দাও :—

১। সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারের কাহিনী সম্পর্কে কি জান ?

২। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা কোন কোন নদীর তীরে অবস্থিত ? বর্তমানে এই দুইটি স্থান কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত ?

৩। বর্তমান ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে? একটি মানচিত্র এঁকে স্থানগুলি দেখাও।

৪। মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনাটি কেমন ছিল? নগরের ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা সম্পর্কে কি জান?

৫। বিখ্যাত স্নানাগারটিকে আধুনিক কালের 'সুইমিং পুলের' সঙ্গে তুলনা করা যায় না কেন?

৬। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে কি জান?

৭। এখানকার লোকেরা কোন কোন দেশের সঙ্গে কেমন ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করত?

৮। এখানকার অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কি জান?

৯। নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের সমাজে শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কি ধারণা করা যায়?

চীন

১। **দুই এক কথায় উত্তর দাও :—**

(ক) যে দুই নদীর উপত্যকায় চীনের প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হয়, তাদের নামগুলি কি?

(খ) এখানকার অধিবাসীরা কি কি শস্য উৎপাদন করত? তাদের শিল্পকর্মের কয়েকটি প্রমাণ দিতে পার কি?

(গ) চীনের উপকথায় পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম কি?

২। **উত্তর দাও :—**

(ক) 'হাজার দুঃখের নদী' কোনটি? এই নাম দেওয়া হয় কেন? চীনাবাসীরা সেই নদীর তীর ছেড়ে যায় নি কেন?

(খ) চীনের উপকথার প্রথম মানুষ কি ভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন?

(গ) বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চীনের উপকথায় কি কাহিনী আছে? এরকম উপকথা সৃষ্টি হয়েছিল কেন?

নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতা

বাঁদিকে কিছু তথ্য দেওয়া আছে। ছককাটা ঘরে যে দেশের পক্ষে যে তথ্য প্রযোজ্য, তা বসাও। এর থেকে প্রাচীন কালে নদীর তীরে যে সভ্যতাগুলির জন্ম হয়েছিল, তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য তোমরা জানতে পারবে।

	মেসোপটেমিয়া	মিশর	সিন্ধু উপত্যকা	চীন
(ক) পলিমাটির অঞ্চল				
(খ) উর্বর জমি—প্রচুর শস্যের ফলন				
(গ) বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ				
(ঘ) উদ্বৃত্ত ফসল				
(ঙ) বাড়তি ফসল বিনিময়ের ফলে বাণিজ্যের প্রসার				
(চ) বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব				
(ছ) পেশাভিত্তিক সমাজ—দক্ষ কারিগর				
(জ) কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদ্ভব				
(ঝ) কৃষক, কারিগর, দাস—অবস্থা ভাল নয়				
(ঞ) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে লিপির উদ্ভব				
(ট) নগর সভ্যতা বা নগর বিপ্লব				

৫। লোহার যুগ

লোহার আবিষ্কার মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে নিয়ে এলো এক যুগান্তকারী বিপ্লব। ধাতু হিসাবে লোহার সঙ্গে তামা বা ব্রোঞ্জের কোন তুলনাই হয় না। যেমন মজবুত ও সহজলভ্য সেই ধাতু, তেমন ধারালো লোহার তৈরি হাতিয়ার। লোহার যুগের উৎপাদন বাড়ল, শ্রেণী বৈষম্য আরও তীব্র হয়ে উঠল। লোহার ব্যবহার যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনে। শাসন ব্যবস্থাতেও আমূল পরিবর্তন সূচিত হল। বর্তমান যুগের সভ্যতার আদি সূচনা হল লোহার ব্যবহার জানার সঙ্গে সঙ্গে। লোহার যুগের সূচনা হয় আনুমানিক ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে।

সভ্যতার অগ্রগতি

আমরা দেখেছি মানুষ প্রথমে বেঁচে থাকার জন্য পুরোপুরি নির্ভর করত পাথরের হাতিয়ারের উপর। তারপর অনেক বছর পার হল। ধীরে ধীরে সে শিখল ধাতুর ব্যবহার। প্রথমে সে আবিষ্কার করল তামা, পরে টিন। তামা ও টিন গলিয়ে মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখল। কিন্তু মানুষ এখানেই থামে নি। সে এবার লোহার আবিষ্কার করল। লোহা আমাদের জীবনে কতখানি প্রয়োজনীয় তা আমাদের চারিদিকে একবার তাকালেই বুঝতে পারব। বাড়ীঘর, যানবাহন, কলকারখানা, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের অনেক জিনিসপত্র, কোনটাই লোহা ছাড়া আমরা কল্পনা করতে পারি না।

লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার ।। এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে লোহার আবিষ্কার হয়। এশিয়া মাইনরের হিট্টাইট জাতিগোষ্ঠীই প্রথমে লোহার আবিষ্কার করে। ঈজিয়ান সাগরের পূর্বে ও কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে পশ্চিম এশিয়ার অঞ্চলটি এশিয়া মাইনর নামে পরিচিত। হিট্টাইটরা এখানকার আর্মেনিয়ান পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর লোহার সন্ধান পায়। তারা লোহা দিয়ে হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি তৈরি করতে আরম্ভ করল। আরম্ভ হল

লোহার ব্যবহারের যুগ। ব্যাপকভাবে লোহার ব্যবহার শুরু হতে অবশ্য আরও কয়েকশো বছর কেটে গিয়েছিল।

লোহার ব্যবহার ও নতুন সমাজ ব্যবস্থা।। লোহার ব্যবহার মানুষের জীবনটাকে একেবারেই পাল্টে দিল। লোহা সহজেই পাওয়া যেত, তাই এর দামও কম ছিল। লোহা ব্যবহারের সুযোগও সকলে পেল। তাছাড়া তামা ও ব্রোঞ্জের থেকে লোহা অনেক বেশী শক্ত ও কঠিন, অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী। লোহার তৈরি হাতিয়ার তাই অনেক বেশী ধারালো। এই প্রথম সমাজের সাধারণ মানুষের হাতে এমন এক ধাতু এল, যার ক্ষমতা ও গুণের সঙ্গে অন্য কোন ধাতুর তুলনাই হয় না। চাষবাস সহজ হল। কৃষির উৎপাদন বাড়ল। গরুর গাড়ী, রথ বা ঘোড়ার গাড়ী, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি যানবাহন অনেক ভালভাবে, সহজে এবং কম খরচায় তৈরি হল। এর ফলে যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সীমাও অনেকটা বেড়ে গেল। সমুদ্রের তীরে তীরে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠল। এই সময় থেকে ব্যাপকভাবে দাসদের উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করা হল। ক্রমশ দাসই মুখ্য শ্রমকারীতে পরিণত হয়েছিল। ধীরে ধীরে দাস পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি হতে লাগল।

যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রেও লোহার প্রচলন বিরাট পরিবর্তন আনে। আগের যুগে ধনী ও প্রভাবশালী মুষ্টিমেয় কিছু বিশিষ্ট লোকই তামা বা ব্রোঞ্জের অস্ত্র ব্যবহার করত। কিন্তু এখন লোহার শক্ত ও ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্রের উপর টেক্কা দিল। লোহার ব্যবহারের ফলে পিছিয়ে পড়া বর্বর জাতিগুলির অভ্যুত্থান ঘটেছিল।

লোহার যুগে সভ্যতার ব্যাপক এবং দ্রুত প্রসার ঘটে। লোহার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত লিপিমালা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাপ ও ওজনের ধাতু মুদ্রার প্রবর্তন সমাজ জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে। ইতিহাস, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ চর্চা ও অনুরাগের সৃষ্টি হয়।

শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন।। তামা-ব্রোঞ্জ যুগে সমাজে উঁচু শ্রেণীর প্রাধান্য খুব বেশী ছিল। চাষী, শিল্পী ও কারিগরেরা তাদের উপরে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এখন লোহা সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় চাষী নিজেই অনাবাদী জমি চাষ করতে পারল। কারিগরেরাও লোহা যোগাড় করে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি করতে পারল। তারা যেন অনেকটাই স্বাধীন ও স্বনির্ভর হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কেমন দাঁড়াল? চাষবাসের উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে যে বিশাল সম্পদ সৃষ্টি হল, অসম বণ্টনের ফলে সেই সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতেই সঞ্চিত হতে লাগল। তারা কিন্তু উৎপাদনের কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। মুষ্টিমেয় ধনীরাই নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ যেমন করেই হোক রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে লাগল। তাদের প্রয়োজনেই আইন-কানুন তৈরি হল, সেপাই-সান্ত্রীর দল এল, তৈরি হল কারাগার। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল এসব প্রয়োজন মেটাবার জন্যই। তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের শেষদিকে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, লোহার যুগে তা আরও পরিপূর্ণ রূপ নিল।

রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ে নানারকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল। কোথাও রাজার শাসন, কোথাও বা মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। রাজার শাসন যেখানে, সেখানে তার প্রবল প্রতাপ। মিশর বা পারস্যের রাজারা যেমন শক্তিশালী তেমন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। তাঁরা যেন ভগবানের প্রতিনিধি রূপেই রাজ্য শাসন করছেন। আবার গ্রীস, ইটালী প্রভৃতি দেশে রাজার শাসন কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এসব রাজ্যে কখনও জমিদার শ্রেণীর শাসন, কখনও অভিজাত শ্রেণীর শাসন এবং কখনও জনগণের শাসন ব্যবস্থার প্রচলন হয়।

ব্যাবিলন সভ্যতা

এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ব্যাবিলন নগরকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী রাজ্যের উত্থান

হয়। মেসোপটেমিয়ায় সুমেরের আধিপত্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। কয়েকশো বছরের মধ্যেই সেখানে আক্কাদ রাজ্য প্রধান হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত আক্কাদেরও পতন ঘটে। ব্যাবিলন শহরকে কেন্দ্র করে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই রাজবংশ সুমের ও আক্কাদকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্যাবিলন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে ধীরে ব্যাবিলন বেশ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ব্যাবিলনের সভ্যতার সূত্রপাত হয়।

ব্যাবিলন শহর ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্বে টাইগ্রিস নদীও মাত্র ৩৫ মাইল দূরে। শহরের অবস্থিতি ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল ছিল। সিরিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনর, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়েই ব্যাবিলন একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

কৃষি ও বাণিজ্য॥ চাষবাসের কাজে ব্যাবিলনবাসীরা মোটেই পিছিয়ে ছিল না। নদীর উর্বর উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য ফলত। যে পরিমাণ বীজ বোনা হত, তার দুশো গুণ বেশী শস্য পাওয়া যেত। তাই শস্য উদ্বৃত্ত থাকত। চাষের জন্য বাঁধ ও খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা ছিল। চাষবাস করে ফসল উদ্বৃত্ত করতে পেরেছিল বলে ব্যাবিলনবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ব্যাবিলনের জীবন। এখানকার লোকেরা তুলা ও পশমের পোষাক-পরিচ্ছদ, কার্পেট তৈরি করত। তাতে থাকত নানা রঙের বাহার। ব্যাবিলন এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে অনেক কাপড়ের কল ছিল। এখানকার সুগন্ধি জল, কারুকার্য-খচিত কাঠের লাঠি, খোদাই করা পাথর, মণিমুক্তার অলঙ্কার বিদেশের বাজারে চড়াদামে বিক্রি হত।

বাণিজ্য চলত পারস্য, ভারতবর্ষ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিশরের সঙ্গে। বিদেশের বণিকেরা রাজ্যের প্রধান শহরগুলিতে ব্যবসা করতে আসত। তাদের সঙ্গে থাকত দামী পাথর, সোনা, রূপা, মশলাপাতি আর দামী রঙ। তুলা আসত সিরিয়া ও ভারতবর্ষ

থেকে। ভারত থেকে সেগুন কাঠ আনা হত। পারস্য থেকে সোনা, দামী পাথর ও রঙ আসত।

রাজ্যের বড় বড় শহরের মধ্যে সড়কে যোগাযোগ ছিল। এক শহর থেকে অন্য শহরে দ্রুত মাল পোঁছানো যেত। নদী, খালের উপরে পুল ছিল। কোথাও বা ছিল নৌকা দিয়ে পারাপারের ব্যবস্থা। শহরের দোকানগুলিতে ভিড় লেগেই থাকত। কেনাবেচায় দর কষাকষি হত। বাজারগুলিতে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ছিল নগর-রক্ষীদের উপরে।

অনেক সময়ে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ব্যবসায়ে লেন-দেন হত। হিসাবরক্ষক মাটির নরম টালির উপরে চুক্তিপত্র লিখত। ক্রেতা, বিক্রেতা, সাক্ষীকে চুক্তিপত্রে সই করতে হত। তারপর সেই মাটির টালির চুক্তিপত্র পুড়িয়ে শক্ত করে রাখা হত। এরকমের চুক্তিপত্র, আয়-ব্যয়ের তথ্য সম্বলিত অনেক টালি ব্যাবিলনের শহর-গুলিতে পাওয়া গেছে।

মন্দির ও পুরোহিত॥ ব্যাবিলনবাসীদের ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অনেকটা সুমেরবাসীদের মত ছিল। লিপি, মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতি সব ব্যাপারেই তারা সুমেরের কাছে ঋণী।

তাদের দেবদেবীর মধ্যে স্বর্গের দেবতা অনু, পৃথিবীর দেবতা এন-লিল্ এবং বায়ু ও জলদেবতা আ ছিলেন প্রধান। পরে মারডুক ব্যাবিলনের নগর দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর প্রতিপত্তিও খুব বেড়ে গিয়েছিল। মাতৃদেবতা ইশ্‌তার যুদ্ধের দেবতা রূপে পূজিত হতেন। বড় বড় সব শহরেই তাঁর মন্দির ছিল। সূর্যদেবতা শামস ছিলেন তাদের ন্যায়-নীতির দেবতা।

এত দেবদেবী যেখানে, সেখানে রাজ্য জুড়ে মন্দির থাকবে, তাতে অবাক হবার কি আছে। মন্দিরগুলি বিশাল ও দেখতে বেশ সুন্দর। মন্দিরগুলি যেমন নগর জীবনের প্রাণকেন্দ্র, তেমন প্রধান ব্যবসা-স্থল। প্রত্যেকটি মন্দিরের প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। মন্দিরের অধীনে অনেকটা জমি থাকত। দাসদের সেই জমিচাষের

কাজে লাগানো হত। পুরোহিত শ্রেণীর অসীম প্রতিপত্তি ছিল। প্রত্যেক মন্দিরে অনেক পুরোহিত থাকত। তাদের মধ্যে অনেক মহিলা-পুরোহিতও ছিল। ব্যাবিলনে মারডুকের মন্দিরে এক হাজারেরও বেশি পুরোহিত ছিল। পুরোহিতেরাই মন্দিরের সম্পত্তি ভোগ করত। তারা কর আদায় করত, আবার ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিত। মন্দিরে শিক্ষা দেওয়া হত। তাই শিক্ষার উপরে পুরোহিতদের কর্তৃত্ব ছিল। পুরোহিতেরা বিচার করত, আইনের বিধান দিত।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ॥ ব্যাবিলনে লেখাপড়ার বেশ চর্চা ছিল। ছেলেমেয়েরা মন্দিরের বিদ্যালয়ে পাঠ নিত। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। অভিধান পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। মেয়েদের শিক্ষার দিকেও যত্ন নেওয়া হত। বিদ্যালয়ে উপস্থিতির কড়া নিয়ম ছিল। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর প্রতিদিনের কাজকর্মের ভিত্তিতে পৃথক বিবরণ-পত্র থাকত। ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা হাম্মুরাবি তাঁর প্রাসাদে একটি বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। গণিত শাস্ত্র, জোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাবিলনে বেশ চর্চা ছিল। আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও গতিবিধি সম্পর্কে ব্যাবিলনবাসীদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।



পাথরে খোদাই করা হাম্মুরাবির আইন-সংহিতার উপরের অংশ

হাম্মুরাবির 'আইন-সংহিতা' ॥ ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা হাম্মুরাবি। আনুমানিক ১৭৯২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে তিনি রাজা হয়ে প্রায় ৪৩ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর নিজের লেখা অনেক চিঠিপত্র এবং নির্দেশনামা পাওয়া গেছে। আমরা জানতে পেরেছি, সাম্রাজ্যের ছোটো-বড়ো অনেক বিষয়ে তিনি নিজেই হস্তক্ষেপ করতেন।

হাম্মুরাবি তাঁর বিখ্যাত 'আইন-সংহিতা'র জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে সুসা শহরে হাম্মুরাবির আইন-সংহিতার একটি অনুলিপি পাওয়া গেছে। আইন-সংহিতায় ২৮২টি অনুচ্ছেদ আছে। ইতিহাসে আইন লিপিবদ্ধ করার নজির এই প্রথম।

সমাজ ।। হাম্মুরাবির আইন-সংহিতা থেকে সে যুগের ব্যাবিলনের সমাজ জীবনের পরিচয় পাই। সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। ভূস্বামী, পুরোহিত ও বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ সমাজে সুরক্ষিত ছিল। সমাজ তিন শ্রেণীতে ছিল—স্বাধীন নাগরিক, সাধারণ প্রজা ও ক্রীতদাস। ক্রীতদাসদের কোন অধিকার ছিল না। স্বাধীন নাগরিক সমাজে নানা সুযোগ সুবিধা ভোগ করত।

সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল ছিল না। তাদের হাতে বেশি জমি থাকত না। ক্রীতদাস রাখার অধিকার ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। হত্যা, চুরি ইত্যাদির জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। হাম্মুরাবির আইন-সংহিতায় প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান ছিল। দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারককে শাস্তি দেওয়া হত।

লিখিত চুক্তিপত্রের উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। বিবাহ, ক্রয়-বিক্রয় বা জমি হস্তান্তর চুক্তিপত্রের মাধ্যমে করতে হত। চুক্তিপত্রে উভয় পক্ষ ও সাক্ষীর সই থাকার নিয়ম ছিল। স্ত্রীলোকেরা অনেক স্বাধীনতা ভোগ করত। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ ছিল। বিধবাদের সমাজে সম্মানজনক স্থান ছিল।

আইন-সংহিতা থেকে জানা যায় যে ব্যাবিলনবাসীরা চাষবাসের কাজে যথেষ্ট উন্নত ছিল। কারিগরী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও তারা বেশ দক্ষ ছিল।

হাম্মুরাবির মৃত্যুর পরে ব্যাবিলন সাম্রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। হাম্মুরাবির রাজবংশের আমল প্রাচীন ব্যাবিলনের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

মিশর : সাম্রাজ্য-শক্তির অভ্যুদয়

এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মিশরের উপরে

এক বর্বর যাযাবর জাতির দৃষ্টি পড়েছিল। তারা আরব দেশে থাকত। যুদ্ধবিদ্যাতে তারা বেশ পারদর্শী ছিল। তারা ঘোড়ার পিঠে বা ঘোড়া-টানা রথে চড়ে যুদ্ধ করত। এই বর্বর জাতি 'হিক্‌সস্' নামে পরিচিত। পূর্বদিকের সমুদ্রতীর দিয়ে হিক্‌সস্‌রা মিশর আক্রমণ ও জয় করে বসল। প্রায় দেড়শো বছর পরে ফেরায়ো আমেস-এর নেতৃত্বে মিশরবাসীরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। শেষ পর্যন্ত হিক্‌সস্‌রা মিশর থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বহুদিন বিদেশী শাসনের পরে মিশরে এক নতুন রাজত্বের সূত্রপাত হল। মিশরের ইতিহাসের এই অধ্যায়কে 'নতুন যুগের রাজত্ব' আখ্যা দেওয়া হয়। এই সময়ে থিবস্ ছিল মিশরের প্রধান শহর ও রাজধানী।

সাম্রাজ্য বিস্তার ॥ হিক্‌সস্‌দের সঙ্গে যুদ্ধ করে মিশরের সেনারা যুদ্ধবিদ্যায় বেশ নিপুণ হয়ে উঠেছিল। ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতেও তারা তখন বেশ পারদর্শী। ফেরায়ো প্রথম থুথমিস সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় মেতে উঠলেন। হিকসস্‌দের শাস্তি দেবার জন্য তিনি তাদের নতুন বাসস্থান সিরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় এটাই ছিল মিশরের প্রথম পদক্ষেপ। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিয়ে প্রথম থুথমিস প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া আক্রমণ ও জয় করেন। প্রচুর ধনসম্পদ ও বহু দাস নিয়ে তিনি বিজয়গর্বে দেশে ফিরলেন।

মিশরের সাম্রাজ্য-শক্তি বিস্তারের ইতিহাসে ফেরায়ো তৃতীয় থুথমিসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁকে রাজা না বলে সম্রাট বলা যেতে পারে। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী। যুদ্ধের জন্য তিনি অনেক রথও তৈরি করিয়েছিলেন। তৃতীয় থুথমিস নিজেও খুব সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। সোনার পাতে মোড়া রথে চড়ে তিনি নাকি যুদ্ধ করতেন। তাঁর অধীনে অনেকগুলি রণতরীও ছিল।

সম্রাট তৃতীয় থুথমিস মোট সতেরোবার এশিয়ায় অভিযান চালিয়েছিলেন। প্যালেস্টাইন ও ফিনিশিয়া তাঁর কাছে পর্যুদস্ত

হয়। তিনি সিরিয়াও জয় করেন। তাঁর নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের কতকগুলি দ্বীপ জয় করে। নিউবিয়া ও নীলনদের পশ্চিমতীরের উপজাতিদেরও পরাজিত করা হয়। তাঁর সাম্রাজ্য ইথিওপিয়া থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শুধু রাজ্য জয় করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। বিজিত দেশগুলি থেকে প্রচুর ধনসম্পদ ও বহু দাস নিয়ে তিনি মিশরে ফিরতেন। রাজধানী থিবসের কারনাক মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিতে সম্রাট তৃতীয় থুথমিসের রাজ্যজয়ের কাহিনী আছে।

ফেরায়ো রামেসিসও রাজ্যলিপ্সু ছিলেন। তাঁর সময়েই শেষবারের মত আবার সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা হয়েছিল। ইতিমধ্যে এশিয়া মাইনরের হিট্টাইট্ নামে একটি শক্তিশালী জাতি অগ্রসর হয়ে প্রায় সমগ্র সিরিয়া দখল করে নিয়েছিল। হিট্টাইট্রা ঘোড়া ও রথের ব্যবহার অনেক আগে থেকেই জানত। তাছাড়া তারা লোহার সন্ধান পেয়েছিল। তা দিয়ে অনেক কঠিন ও ধারালো অস্ত্রশস্ত্রও তৈরি করেছিল। সিরিয়া একসময়ে মিশরের উপনিবেশ ছিল। স্বভাবতই রামেসিস হিট্টাইট্দের পরাজিত করে সিরিয়াতে আবার মিশরের প্রভুত্ব বিস্তার করতে চাইলেন। বহুদিন ধরে যুদ্ধ চলল। কোনপক্ষই চূড়ান্ত জয়লাভ করতে পারে নি। তাঁর রাজত্ব-কালের পরে মিশর ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

পুরোহিতদের ক্ষমতা॥ নতুন রাজত্বের যুগে পুরোহিতেরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে থিবসের কারনাক মন্দিরের পুরোহিতেরা ছিল আরও শক্তিশালী। দেবতা আমন-এর মন্দির এটি। থিবসের প্রধান দেবতা আমন। মন্দিরটি ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু ধ্বংসাবশেষ যেটুকু আছে তাতে নিপুণ শিল্পীর হাতের স্পর্শ পাওয়া যায়। মন্দিরের হলঘরটি শুধু স্তম্ভের উপরে নির্মিত। স্তম্ভগুলি কিন্তু গেঁথে গেঁথে তৈরি হয় নি। এক একটি পাথর খোদাই করে এক একটি স্তম্ভ তৈরি হয়েছিল।

মিশরে পুরোহিতদের কি অসীম প্রতিপত্তি ছিল তার কিছু

পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। মন্দিরগুলি ছিল প্রচুর সম্পত্তির মালিক। পুরোহিতেরা মন্দিরের সম্পত্তি নিজেরাই ভোগ করত। তাদের জীবনযাত্রাও ছিল বিলাসে ভরপুর। ফেরায়ো মাঝে মাঝেই মন্দিরের নামে জমি দান করতেন, নানারকমের উপহার পাঠাতেন। সবটাই পুরোহিতদের ভোগে লাগত। থিবসের আমন দেবতার মন্দির সম্রাটদের অনুগ্রহ বেশী লাভ করেছিল। তার ফলে এই মন্দিরের পুরোহিতেরাও খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তারা ফেরায়োর ক্ষমতা ও শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল।

থিবসের পুরোহিতদের এমন ক্ষমতা বাড়ার ফলে দেশের অন্যান্য পুরোহিতেরাও রুষ্ট হয়। এই সুযোগে ফেরায়ো আমেনহোটেপ এক নতুন ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করলেন, সূর্য বা এটন হচ্ছেন একমাত্র দেবতা। তিনি নিজে হচ্ছেন এটনের প্রতিনিধি। এখন থেকে তিনি নিজে নতুন নাম গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম হল—ইখানিটন বা 'এটনের প্রিয়'।

কিন্তু ইখানিটনের চেষ্টা ব্যর্থ হল। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে তিনি বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সংস্কারগুলিও বাতিল হয়ে যায়। পুরোহিতদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আবার বেড়ে যায়। অনেক পুরোহিত একেবারে স্বাধীন হয়ে উঠল। তারা আর ফেরায়োর কর্তৃত্ব মানতে চাইল না।

মিশরের দুর্দিনও ঘনিয়ে এসেছিল। আর বেশীদিন মিশর একজন ফেরায়োর অধীনে ঐক্যবদ্ধ রইল না। মিশর বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর পরে কিছুকাল মিশর অ্যাসিরিয়ার অধীনে ছিল। পরে পারসিক বা ইরানীদের হাতে যায়। তারপরে মিশরে গ্রীক রাজত্ব স্থাপিত হয়। শেষ পর্যন্ত মিশর রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূর্ত হয়ে পড়েছিল।

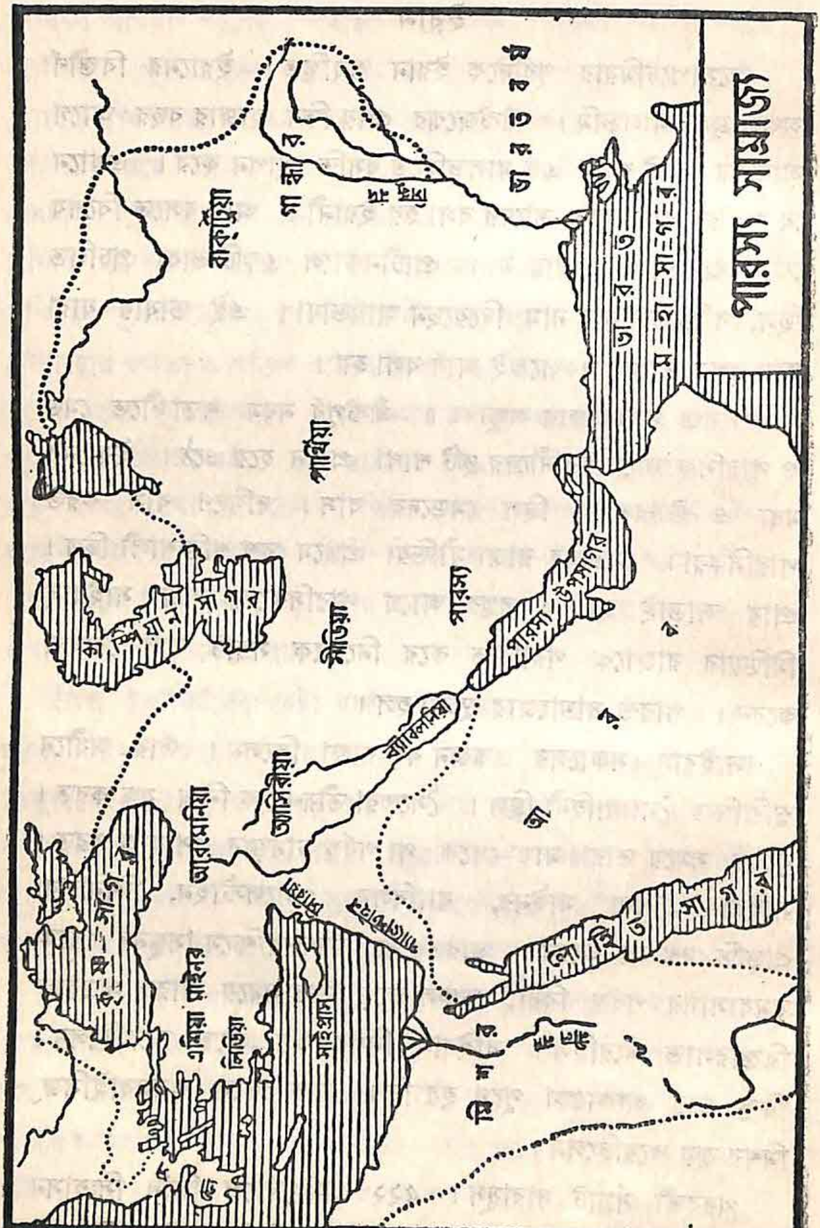
ইরান

মেসোপটেমিয়ার পূর্বদিকে ইরান অবস্থিত। ইরানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মালভূমি। খ্রীস্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে আর্যদের একটি শাখা এই মালভূমিতে বসতি স্থাপন করে। এখানে যে আর্যরা বাস করত তাদের বলা হয় ইরানী। আর্য বলতে বিশেষ কোন জাতিকে বোঝায় না। প্রাচীনকালে একটি ভাষা প্রচলিত ছিল, পণ্ডিতেরা যার নাম দিয়েছেন আর্যভাষা। এই ভাষায় যারা কথা বলত তাদের সকলকেই আর্য বলা হয়।

পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়॥ খ্রীস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে মেড ও পারসিক নামে ইরানীদের দুটি শাখা প্রধান হয়ে ওঠে। ইরানের মধ্য ও উত্তরভাগে ছিল মেডদের বাস। দক্ষিণে বাস করত পারসিকরা। মেডদের রাজ্য মীডিয়া প্রথমে বেশ শক্তিশালী ছিল। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পারসিকদের রাজা সাইরাস্ মিডিয়ার রাজাকে পরাজিত করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। পারস্য সাম্রাজ্যের সূচনা হল।

সাইরাস্ সেকালের একজন বড় রাজা ছিলেন। তাঁর অধীনে সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী ছিল। সৈন্যেরা তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত। যুদ্ধের সময়ে তারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত চামড়ার পোষাক পরত। সাইরাস্ এশিয়া মাইনর, ব্যাবিলন, প্যালেস্টাইন, ফিনিশিয়া প্রভৃতি দেশ জয় করেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুনদ থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল জুড়ে তাঁর সময়ে পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করেছিল। সাইরাস্ মিশর জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় নি। তাঁর ছেলে ক্যামবাইসিজ্ মিশর জয় করেছিলেন।

পরবর্তী সম্রাট দারায়ুস। ৫২২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে তিনি সিংহাসন আরোহণ করে ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করেছিলেন। রাশিয়ার ভল্‌গা নদীর তীর থেকে ভারতের সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভারতবর্ষ


পারস্য সাম্রাজ্য
ভারতবর্ষ
গান্ধার
বাকট্রিয়া
পার্থিয়া
কাস্পিয়ান সাগর
মীডিয়া
পারস্য
পারস্য উপসাগর
আরব সাগর
আরমেনিয়া
আসিরীয়া
ব্যাবিলনিয়া
কৃষ্ণ সাগর
এশিয়া মাইনর
লিডিয়া
সাইপ্রাস
লোহিত সাগর
মিশর

থেকে তিনি কর হিসাবে প্রচুর পরিমাণে সোনা পেতেন। বেহিস্তানের পাহাড়ের গায়ে দারায়ুস তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী তিনটি প্রাচীন ভাষায় লিখে রেখেছেন।

দারায়ুস সুশাসক ছিলেন। শাসনের সুবিধার জন্য তিনি বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যকে কতকগুলি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে শাসনকর্তা ছিল। সম্রাট তাদের নিযুক্ত করতেন। সব কাজের জন্য তারা সম্রাটের কাছেই দায়ী থাকত।

দারায়ুস মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি একধরনের মুদ্রা চালু করেছিলেন। প্রাচীনকালে এই প্রথম এক মুদ্রা এতবড় এলাকায় চালু হল। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছিল। সম্রাট সেগুলি সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেছিলেন। রাস্তার মাঝে মাঝে ছিল সরাইখানা।

শেষজীবনে দারায়ুস গ্রীস জয় করবার চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টা সফল হয় নি। ম্যারাথনের যুদ্ধে পারসিকরা গ্রীকদের কাছে পরাজিত হয়। দারায়ুসের ছেলে জারেকসেস্ গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। থার্মপিলির যুদ্ধে পারসিকদের কোনরকমে জয় হলেও স্যালামিসের নৌযুদ্ধে তাদের শোচনীয় পরাজয় হয়।

জরথুস্ত্র ও তাঁর ধর্মমত॥ ইরানীরা প্রথমে অনেক দেবদেবীর পূজা করত। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জরথুস্ত্র নামে প্রকজন মহাপুরুষ তাদের মধ্যে এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। সম্রাট দারায়ুসের আমলে জরথুস্ত্রের প্রচারিত ধর্ম ইরানীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। জরথুস্ত্রের মতে এই পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যা, ভাল ও মন্দ, আলো ও অন্ধকার—এই বিপরীত শক্তিগুলির মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলছে। যিনি সত্যের দেবতা, তাঁর নাম আহুর-মজ্‌দা। তিনি আলো ও স্বর্গের অধিপতি। অন্ধকারের রাজ্যে বাস করেন অসত্যের দেবতা। তাঁর নাম আহ্রিমন। মানুষ যদি সৎপথে থাকে, সদাচরণ করে, তবে আহুর-মজ্‌দার পূজা করা হবে। কল্যাণ শক্তির জয় হবে। জরথুস্ত্র

সকলকে সৎজীবন যাপন করে আহুর-মজ্‌দার পূজা করতে বলতেন। তাঁর উপদেশ ও গাথাগুলি 'আবেস্তা' নামে একখানি ধর্মগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। 'আবেস্তা' ইরানীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

ইহুদীদের কথা

হিব্রুরা প্রথমে ছিল যাযাবর। নানা জায়গায় তারা ঘুরে বেড়াত। এখনকার ইহুদীদের পূর্বপুরুষ হিব্রুরা। এক সময়ে তারা ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে কানান্ প্রদেশে যায়। নদী পার হয়ে এসেছিল বলে কানান্ প্রদেশের লোকেরা তাদের হিব্রু বলত। যারা নদী পার হয়ে এসেছে, তাদের বোঝাতেই 'হিব্রু' কথাটি তারা ব্যবহার করত। কোন এক সময়ে হিব্রুরা মিশরদেশে যায়। মিশরের সবচেয়ে উর্বর এলাকাতে তারা বসবাস করতে থাকে।

মিশরে হিব্রুরা ॥ মিশরে প্রথম দিকে তারা বেশ সুখে শন্তিতেই ছিল। চাষবাস করে তারা বেশ পয়সাও করেছিল। তাদের সংখ্যাও বাড়ছিল দিন দিন। কিন্তু তাদের সুখ সমৃদ্ধিতে শঙ্কিত হলেন ফেরায়ো দ্বিতীয় রামেসিস। তিনি হিব্রুদের শাস্তি দিতে চাইলেন।

তিনি কড়া কড়া নির্দেশ জারী করতে লাগলেন। শুরু হল মিশরে হিব্রুদের দাসত্বের যুগ। রাস্তাঘাট, পিরামিড তৈরির কাজে তাদের লাগানো হল। জোর করে ইঁটখোলায় বা মাঠে চাষের কাজে তাদের খাটানো হতে লাগল। ফেরায়ো হিব্রুদের শ্রমেই পিথম্ ও রামেসিস নামে দুটি সুন্দর নগর তৈরি করালেন। কাজের অবহেলা হলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। নবজাত হিব্রু শিশুকেও নৃশংস-ভাবে হত্যা করা হতে লাগল। হিব্রুদের অবস্থা তখন সঙ্কটাপন্ন। ক্রীতদাসের মত তারা মিশরে কোনরকমে বেঁচে রইল।

মোজেস ॥ এই সময়ে তাদের মধ্যে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম মোজেস। আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মোজেস মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। হয়তো জন্মলগ্নে তাঁরও মৃত্যু হত। কিন্তু মোজেসের হিব্রু পিতা-মাতা সন্তানকে নদীর ধারে লুকিয়ে

রেখেছিলেন। ফেরায়োর মেয়ে তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসে এবং সেখানেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। কিছুদিনের জন্য তাঁকে আরব দেশের মরুভূমিতে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। বাইবেলের কাহিনীতে আছে, তিনি ভগবানের নির্দেশ পেয়ে হিব্রুদের মুক্ত করতে আবার মিশরে ফিরে আসেন।

দাসত্ব থেকে হিব্রুদের মুক্তি ॥ মিশরে এসে মোজেস ফেরায়োর অত্যাচার থেকে হিব্রুদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে একদিন তিনি তাদের নিয়ে মিশর ছেড়ে রওনা হলেন। কিন্তু ফেরায়ো সহজ লোক ছিলেন না। তাদের ধরে আনার জন্য বিরাট সৈন্যদল পাঠালেন।

হিব্রুরা ততক্ষণে লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছেছে। সামনে সমুদ্র, পিছনে ফেরায়োর সৈন্য। পালাবার কোন পথ নেই। এই বিপদে মোজেস বিচলিত হলেন না। বাইবেলে কথিত আছে, তিনি হাত তুললে সমুদ্র দুভাগ হয়ে গেল, মাঝখান দিয়ে শুক্‌নো পথ। সেই পথ ধরে হিব্রুরা সমুদ্র পার হয়ে গেল। এবার মোজেস হাত তুলে আবার সমুদ্রকে এক করে দিলেন। ফেরায়োর সৈন্যরা ডুবে মরল। মোজেস হিব্রুদের প্যালেস্টাইনের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন। তারপরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মোজেসের মৃত্যুর পরে হিব্রুরা প্যালেস্টাইনে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে।

মোজেসই হলেন হিব্রুদের প্রকৃত জনক। যাযাবর একটি উপজাতিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতিতে পরিণত করেছিলেন। দাসত্ব থেকে হিব্রুদের মুক্ত করার কৃতিত্ব তাঁরই। মিশর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিব্রুদের দাসত্বের অবসান হয়েছিল।

গ্রীস

গ্রীসের তিনদিক ঘিরে রয়েছে ভূমধ্যসাগরের নীল জল। আর নীল আকাশমুখী হয়ে রয়েছে সারা দেশময় ছড়ানো পাহাড় পর্বতের চূড়া। তিন দিক সাগরজলে ঘেরা থাকতে সমুদ্রের একটা মস্ত বড় প্রভাব গ্রীসের উপর ছিল।

ক্রীটের প্রভাব ॥ গ্রীসের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের একটি ছোট দ্বীপের নাম ক্রীট। প্রায় চার পাঁচ হাজার বছর আগে ক্রীটে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ক্রীটের এক পৌরাণিক



গ্রীস, ক্রীট ও ঈজিয়ান সাগর

রাজার নাম মিনস্। তার নাম থেকেই এখানকার সভ্যতার নাম হয় মিনোয়ান সভ্যতা। এই মিনোয়ান সভ্যতা প্রাচীন গ্রীসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ক্রীটবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উন্নতি করেছিল। ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিতে, মিশরে, এশিয়া মাইনরে ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে ক্রীটের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ব্যবসা-বাণিজ্য করে ক্রীট খুব ধনী দেশ হয়। সেখানে গড়ে ওঠে বড় বড় শহর ও বন্দর।

সবচেয়ে বড় শহর ছিল নোসস্। এই নোসস্‌ই ছিল ক্রীটের রাজধানী। নোসসের রাজার রাজপ্রাসাদটির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। নোসস্ রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ প্রাচীন ক্রীটের অভাবনীয় শিল্প ও সমৃদ্ধির কথাই বলে।



গ্রীসের পোড়া মাটির পাত্র

এক সময় ক্রীটের ধ্বংস হল, কিন্তু ক্রীটের মিনোয়ান সভ্যতার মৃত্যু হয় নি। এই সভ্যতা গ্রীসকে আশ্রয় করে বেঁচে রইল। প্রাচীন গ্রীসে সবচেয়ে নামকরা শহর ছিল মিসেনী। মিসেনী ছিল দক্ষিণ গ্রীসে। এই শহরটিই হল নতুন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। মিনোয়ান সভ্যতার শেষ হল। কিন্তু নবরূপে মিসেনীকে কেন্দ্র করে শুরু হল গ্রীসে মিসেনীয় সভ্যতা।

হোমারের যুগ ॥ মিসেনীয় সভ্যতার যুগের বীর নায়কদের নিয়েই হোমার রচনা করেন দুই গ্রীক মহাকাব্য—ইলিয়াড ও ওডেসি।

হোমার সম্পর্কে আমরা ভালরকম কিছু জানি না। খুব সম্ভবত তিনি এশিয়া মাইনরের কোন শহরে বাস করতেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বীরদের গাথা গাইতেন এবং অপূর্ব গল্প বলতেন। শোনা যায় কবি হোমার ছিলেন অন্ধ।

ইলিয়াড—এশিয়া মাইনরের একটি ছোট দেশ ট্রয়। তার রাজকুমার প্যারিস গ্রীসের সুন্দরী রাণী হেলেনকে চুরি করে নিয়ে যায়। গ্রীকরা তাদের রাণী হেলেনকে উদ্ধারের জন্য ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। গ্রীসের সঙ্গে ট্রয়ের যুদ্ধ দশ বছর ধরে চলে। ট্রয় হেরে যায় এবং ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়। ট্রয়ের এই বিখ্যাত যুদ্ধের কাহিনী নিয়েই রচিত হয় ইলিয়াড মহাকাব্য।

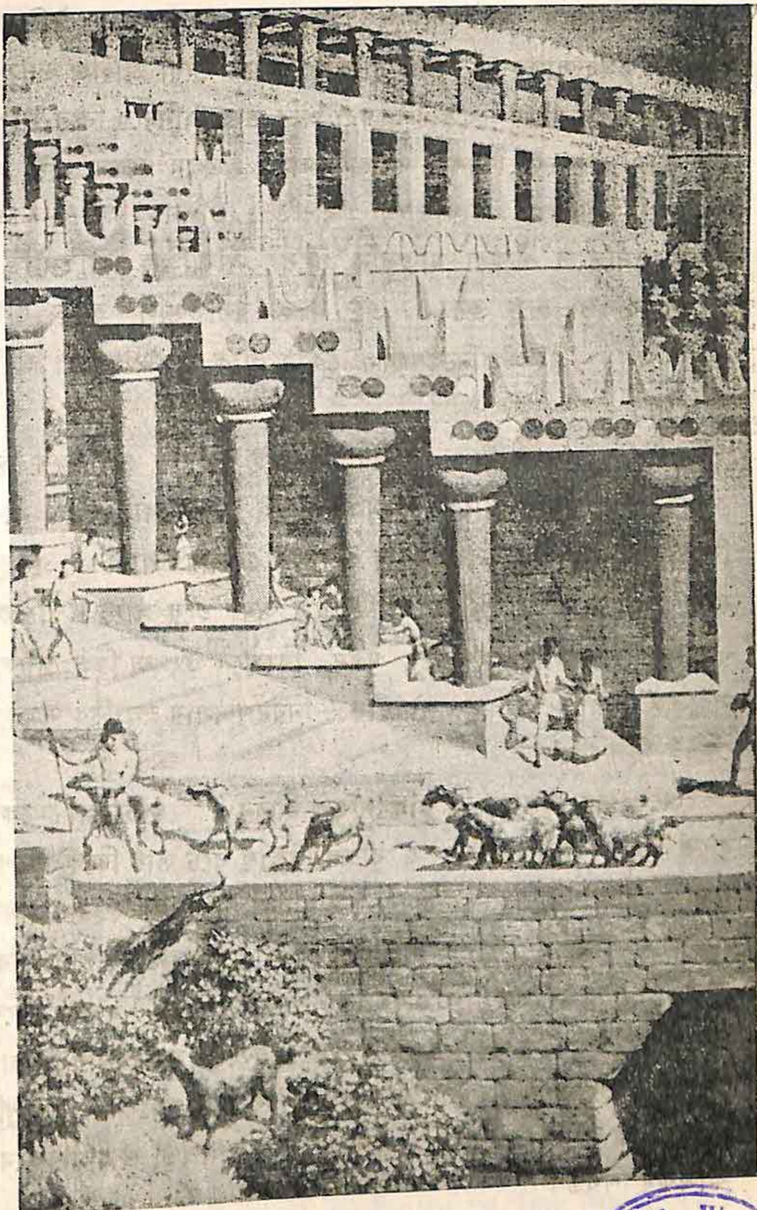
ওডেসি—ট্রয়ের যুদ্ধের একজন বিখ্যাত গ্রীক বীরের নাম অডিসিউস্ বা ইউলিসিস্। ট্রয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর তিনি দেশে ফেরার জন্য সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। ইউলিসিসের দেশে ফেরার দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী নিয়েই ওডেসি মহাকাব্য।

হোমারের কাহিনীতে কল্পনার সঙ্গে সত্যও মিশে আছে। জার্মানীর হেইনরিখ শ্লীম্যান ইলিয়াডের কাহিনীর সূত্র ধরে কালের অতলে হারিয়ে যাওয়া ট্রয় এবং মিসেনী নগর দুটির অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতক পর্যন্ত গ্রীসের দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে জানতে হলে হোমারের দুই মহাকাব্যের উপর নির্ভর করতে হয়। চারশ বছরের এই দীর্ঘ সময়টা হোমারের যুগ বলে চিহ্নিত।

গ্রীক নগর রাষ্ট্র॥ সারা গ্রীসে পাহাড়-পর্বত দিয়ে ঘেরা অনেক উপত্যকা আছে। এই উপত্যকাগুলিতে কোন বড় নগর ও তার চারদিকের কিছু গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক একটি নগর রাষ্ট্র। গ্রামে চাষবাস হত এবং সেখান থেকে খাদ্যশস্যের যোগান যেত নগরে। নগরে বাস করত রাষ্ট্রের প্রধানরা, অভিজাত ধনীরা এবং শিল্পী ও কারিগরেরা। নগর রাষ্ট্রগুলি ছিল স্বাধীন। তবে অল্প কিছু লোকই স্বাধীন ছিল। প্রতি নগর রাষ্ট্রেই অনেক দাস ছিল। তারা সবরকম শ্রমের কাজ করত। তারা স্বাধীন ছিল না।

প্রত্যেক নগর রাষ্ট্র ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সুরক্ষিত, কেননা সেগুলি ছিল পাহাড়-পর্বত দিয়ে ঘেরা। তারা মাঝে মাঝে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করত। তবে গ্রীসের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সব গ্রীক রাষ্ট্র থেকে খেলোয়াড়রা এসে যোগ দিত। বর্তমান কালের 'অলিম্পিক গেমস্' প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিয়া গেমস্ থেকেই প্রেরণা পেয়েছে। সকল নগর রাষ্ট্রেরই ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল এক।

গ্রীক উপনিবেশ॥ প্রথম প্রথম নগর রাষ্ট্রের গ্রীক বণিকরা



নোসসের রাজপ্রাসাদের বাইরের দিক

জাহাজ ভাসিয়ে দেশ বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা করত। ঈজিয়ান সাগর, ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরের তীরে তারা জাহাজ ভাসিয়ে যেত। সঙ্গে নিয়ে যেত শিল্পদ্রব্য আর তার বিনিময়ে নিয়ে আসত খাদ্যশস্য, গরুভেড়া, পশম ও ক্রীতদাস। ক্রমে ক্রমে এই সব অঞ্চলে গ্রীকরা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। এই নতুন বসতিতে গ্রীকরা মাতৃভূমি গ্রীসের সামাজিক রীতিনীতি ও শাসন ব্যবস্থা চালু করে। এই গ্রীক বসতিগুলি হচ্ছে গ্রীক উপনিবেশ। এই উপনিবেশগুলি কোন গ্রীক নগর রাষ্ট্রের অধীন ছিল না।

এথেন্স ও স্পার্টা॥ আমরা আগেই দেখেছি গ্রাস দেশ ছিল অনেকগুলি নগর রাষ্ট্রের সমষ্টি। এই নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল মধ্য গ্রীসের এথেন্স ও দক্ষিণ গ্রীসের স্পার্টা। এই দুই নগর রাষ্ট্রের কীর্তি গ্রীসের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। শিক্ষা-দীক্ষায়, শিল্পকলায়, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানে এথেন্স ছিল গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী। আবার শৌর্যবীর্য ও নিয়মশৃঙ্খলায় স্পার্টার সমকক্ষ কেউই ছিল না।

এথেন্সের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন॥ ছোটবেলা থেকেই যাতে এথেন্সবাসীদের মন ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটে তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হত। ছেলেরা সাধারণত চৌদ্দ বছর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়ত। তারা ইতিহাস, কাব্য, গানবাজনা, ছবি আঁকা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত। ষোল বছর বয়স থেকে ছেলেদের শরীর গঠনে বিশেষ যত্ন নিতে হত। যুদ্ধ-বিদ্যার শিক্ষাও তাদের গ্রহণ করতে হত। তেইশ বছর বয়স হলে যুবকেরা পুরোপুরি নাগরিকের অধিকার পেত। মেয়েরা ঘরে লেখাপড়া ও নানারকমের কাজকর্ম শিখত।

লেখাপড়া, শিল্পকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসনকার্য ইত্যাদিতে তাদের দিন কাটত। স্বাধীন নাগরিকেরা নগরবাসীদের সভায় দেশের শাসন বিষয়ক কাজ ও আলোচনায় যোগ দিত। তারা

খেলাধুলা খুব ভালবাসত। আর তাদের প্রিয় ছিল নাটক ও অভিনয়। মুক্ত আকাশের নীচে ছিল তাদের রঙ্গমঞ্চ। খোলা জায়গায় বসে তারা অভিনয় উপভোগ করত।

অন্যান্য নগর রাষ্ট্রের মত এথেন্সে প্রথমে রাজার শাসন ছিল। পরে অভিজাত জমিদার শ্রেণী দেশ চালায়। কিন্তু তাদের শাসন খুব খারাপ ছিল। এথেন্সবাসীরা দেশে সুশাসন ও আইনশৃঙ্খলা আনার জন্য ড্রাকো নামে এক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বেছে নেয়। ড্রাকোর নিয়মকানুন ছিল খুবই কঠোর। ড্রাকোর পর সোলন, পিসিট্রেস্টাস্ ও ক্লিস্থেনিস্ এথেন্সে সুশাসন ও গণতন্ত্র স্থাপনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দেশ শাসন করার ব্যাপারে প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের মতামত গ্রহণ করা হত।

স্পার্টার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন ॥ স্পার্টার অধিবাসীদের বলা হয় স্পার্টান। স্পার্টানদের জীবনযাত্রা এথেন্সবাসীদের জীবনযাত্রা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্পার্টা দক্ষিণ গ্রীসে তার ক্ষমতা বিস্তার করে এবং একটি শক্তিশালী নগর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে স্পার্টার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দেশের বাড়তি মানুষের থাকা ও খাওয়ার জন্য স্পার্টানরা রাজ্য বিস্তারে মন দেয়। রাজ্য জয়ের জন্য তারা দিনে দিনে সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। তাদের জীবনযাপনের ধারাই পাল্টে যায়। তাদের জীবন ছিল সৈনিকদের মত কঠোর নিয়মে বাঁধা। শক্তিমান যোদ্ধা হয়ে ওঠাই তাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ ছিল। দৈহিক সামর্থ্য না থাকলে তাদের বাঁচার অধিকার ছিল না। শিশু যদি রুগ্ন হত তাহলে তাকে মেরে ফেলার জন্য পাহাড়ে পর্বতে ফেলে আসা হত।

সাত বছর বয়স থেকেই স্পার্টানদের যুদ্ধ বিদ্যা শিখতে হত। শিক্ষাকালে তাদের বেতমারা হত, ঠিকমত খেতেও দেওয়া হত না। তাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করা হত। এর ফলে তারা বড় হয়ে সব রকমের কষ্ট ও শাস্তি মেনে নিতে পারত। তারপর বড় হলে

তারা সেনানিবাসে বাস করত। মেয়েদেরও কঠোরভাবে জীবন-যাপনের শিক্ষা দেওয়া হত, কেননা তাদের তো বীর সন্তানদের জননী হতে হবে।

স্পার্টানদের জীবন এরকম থাকায় তাদের মনে কোন কোমলতা ছিল না। তারা গান গাইত না, কবিতা ভালবাসত না, সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরত না। বাইরের জগতের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ ছিল না। স্পার্টানরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের জীবনে কোন আনন্দ ও স্ফূর্তি ছিল না।

স্পার্টার অধিবাসীরা ছিল খুব রক্ষণশীল। প্রথমে স্পার্টায় রাজার শাসন ছিল। কিন্তু পরে রাজা নামে মাত্রই ছিলেন। কাউনসিল নামে একটি বয়স্ক ও ধনী লোকদের সভা ছিল। দেশ শাসনে এই সভার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। এ্যাসেমব্লী নামে আর একটি নাগরিকদের সভা ছিল। কিন্তু তবুও স্পার্টাতে এথেন্সের মত গণতন্ত্র ছিল না। স্পার্টাতে বহু দাস ছিল। তারা সব রকমের খাটাখাটুনির কাজ করত। তাদের বলা হত হেলট। তারা খুব নির্যাতিত হত। তারা স্পার্টানদের খুব ভয় করত। তাদের সেবাতেই হেলটদের জীবন কাটত।

এথেন্সের স্বর্ণযুগ ॥ এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যে সম্রাট দারায়ুস্ এবং তার পুত্র জারেক্সেস্ গ্রীস আক্রমণ করেন। পারসিক সম্রাটদের সঙ্গে যুদ্ধে এথেন্সের গৌরবময় ভূমিকা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করার পর পঞ্চাশটা বছর এথেন্সের জাতীয় জীবনে স্বর্ণযুগ। জারেক্সেসের পারসিক সৈন্যরা এথেন্স নগরীর অনেক ক্ষতি করেছিল। কিন্তু এথেন্সবাসীরা আবার নতুন উদ্যমে এথেন্সকে গড়ে তুলল। এই সময়ে যাঁর নেতৃত্বে এথেন্স বড় হয়ে উঠল, তিনি গ্রীস ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তি পেরিক্লিস।

পেরিক্লিস ছিলেন এক অসাধারণ জনপ্রিয় নেতা। তিনি ৩০ বছর ধরে এথেন্সের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ ও সুবক্তা। শিক্ষা-দীক্ষায় ও শিল্প-সৌন্দর্যে এথেন্সকে গ্রীসের শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করাই ছিল পেরিক্লিসের আদর্শ। তিনি তাঁর আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। পেরিক্লিস এথেন্সে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এসব কারণে পেরিক্লিসের আমল গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগ নামে পরিচিত।

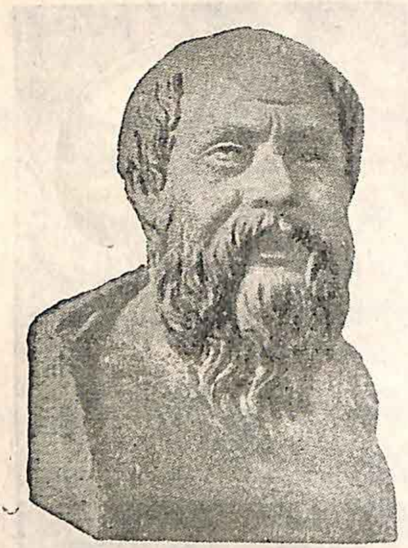


পেরিক্লিস

সাহিত্য ॥ সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রীক নাট্য প্রতিভা যুগ যুগ ধরে সমাদর পেয়ে আসছে। সে যুগের চারজন বিখ্যাত নাট্যকারের নাম হচ্ছে এ্যাসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপাইডিস এবং এ্যারিস্টফেনিস। গ্রীক ট্রাজেডী বা বিয়োগান্ত নাটকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন **সোফোক্লিস**। তাঁর লেখা নাটকগুলি অপূর্ব। বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ। যে সব কাহিনী করুণ এবং দুঃখজনক ঘটনায় শেষ হয়, তাকে ট্রাজেডী বলে। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'আন্টিগণে' আজও মানুষের চোখে জল আনে।

দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও এথেন্সের ভূমিকা অসামান্য। সক্রেটিস, প্লেটো এবং এ্যারিস্টটল চিন্তার রাজ্যে যে আলোড়ন এনেছিলেন, তার মূল্য আজও কমে নি। দার্শনিক **সক্রেটিসের** মত জ্ঞানী ও

নিষ্ঠাবান লোক পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি এথেন্সের পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন এবং প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকশিক্ষার প্রচার করতেন। তিনি মিথ্যা, অন্যায় ও অজ্ঞানের পরম শত্রু ছিলেন। সক্রেটিস দেখতে সুন্দর ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সুন্দর স্বভাবই তাঁকে প্রিয় ও সুন্দর করে তুলেছিল। তবে তিনি অনেকের কাছেই অপ্রিয় ছিলেন।

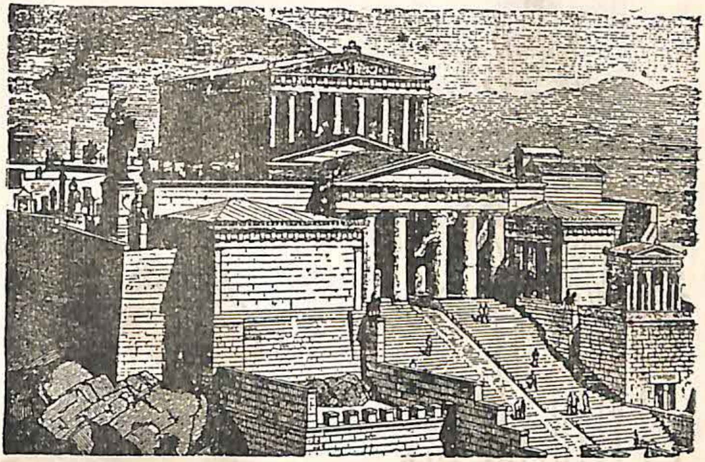


সক্রেটিস

চিরকালই সত্যের পূজারীরা দেশের স্বার্থপর প্রভাবশালী লোকেদের কাছে অপ্রিয় হন। তার উপর সক্রেটিসের গ্রীক দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল যে, তাঁর শিক্ষা দেশ ও সমাজের ক্ষতি করছে। বিচারে তাঁর শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। তাঁকে মৃত্যুভয় বিচলিত করতে পারে নি। তিনি কারাগারে শান্তভাবে বিষপান করে প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স সত্তর বছর।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ॥ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এথেন্সে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল। এই সময়ে এথেন্সে সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘর ও মন্দির নির্মিত হয়। ইকটিনাস নামে এক বিখ্যাত স্থপতি ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে চমৎকার ঘর বাড়ী তৈরি হয়। পার্থেনন নামে দেবী এথেনার মন্দির এথেন্সের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভাস্করদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ফিডিয়াস। তাঁর তৈরি দেবী এথেনার মূর্তি এবং দেব প্রধান জিউসের মূর্তি চিরকালের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

ধর্ম ॥ গ্রীকরা মনে করত যে, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে বিভিন্ন দেবদেবীরা পরিচালিত করেন। গ্রীক দেবদেবীদের



পার্থেনন

আচার আচরণ সাধারণ মানুষদের মতই। শুধু পার্থক্য এই যে, তাঁরা খুব শক্তিশালী এবং অমর। দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জিউস। তিনি আকাশ, বজ্র ও বিদ্যুতের দেবতা। জিউস কন্যা দেবী এথেনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী এবং এথেন্স নগরীর রক্ষাকর্ত্রী। পজিডন ছিলেন সমুদ্রের দেবতা। এ্যাপোলো ছিলেন সূর্যের দেবতা। তিনি শিল্প, সৌন্দর্য ও যৌবনেরও দেবতা। গ্রীকরা এরকম বহু দেবদেবীর উপাসনা করত। তারা মনে করত যে, দেবদেবীরা আলম্পাস পর্বতের চূড়ায় থাকেন।

এথেন্স-স্পার্টা দ্বন্দ্ব ॥ পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধজয়ের পর এথেন্সের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। পেরিক্লিসের সময় সে সারা গ্রীসের উপর প্রাধান্য স্থাপনে অগ্রসর হল। স্পার্টারও একই উদ্দেশ্য ছিল। সেও কম শক্তিশালী দেশ নয়। সমস্ত গ্রীসের উপর আধিপত্য স্থাপন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দুটি রাষ্ট্রেরই ছিল। ফলে দুই

রাষ্ট্রের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ খ্রীস্টজন্মের ৪৩১ বছর আগে আরম্ভ হয় এবং ২৭ বছর ধরে চলেছিল। এই যুদ্ধ



দেবী এথেনা



এ্যাপোলো

ইতিহাসে বিখ্যাত পেলোপনেসীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত। গ্রীসের প্রায় সকল নগর রাষ্ট্রই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের ফলে শক্তিশালী দুই নগর রাষ্ট্র এথেন্স ও স্পার্টা দুর্বল হয়ে যায়। তাদের অতীত গৌরব তারা হারিয়ে ফেলল।

পেলোপনেসীয় যুদ্ধের সময় ঐতিহাসিক থুকিডাইডিস জীবিত ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধের বিবরণ রেখে গেছেন। তিনি যা দেখেছেন তাই লিখে গেছেন, শুনে কিছু লেখেন নি। সে কারণে প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

থুকিডাইডিসের সমসাময়িক আর একজন বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক ছিলেন, তাঁর নাম **হেরোডোটাস**। তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তিনি গ্রীস এবং পারস্যের মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস

লিখে গেছেন। মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি রাজ্যে তিনি গিয়েছিলেন। তার বিবরণ থেকে প্রাচীন গ্রীস, মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।



হেরোডোটাস

ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডার ॥ গ্রীসের উত্তরে ম্যাসিডন নামে ছোট এক রাজ্য ছিল। পেলোপনেসীয় যুদ্ধের সময় সে দেশের রাজা ছিলেন ফিলিপ। ফিলিপ পেলোপনেসীয় যুদ্ধের পর গ্রীসে আধিপত্য স্থাপন করেন।

ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ম্যাসিডন ও গ্রীসের রাজা হন। মহাপণ্ডিত গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল তাঁর গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। আলেকজাণ্ডার গ্রীস ও ম্যাসিডনের রাজা হয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি দ্বিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন।



আলেকজাণ্ডার

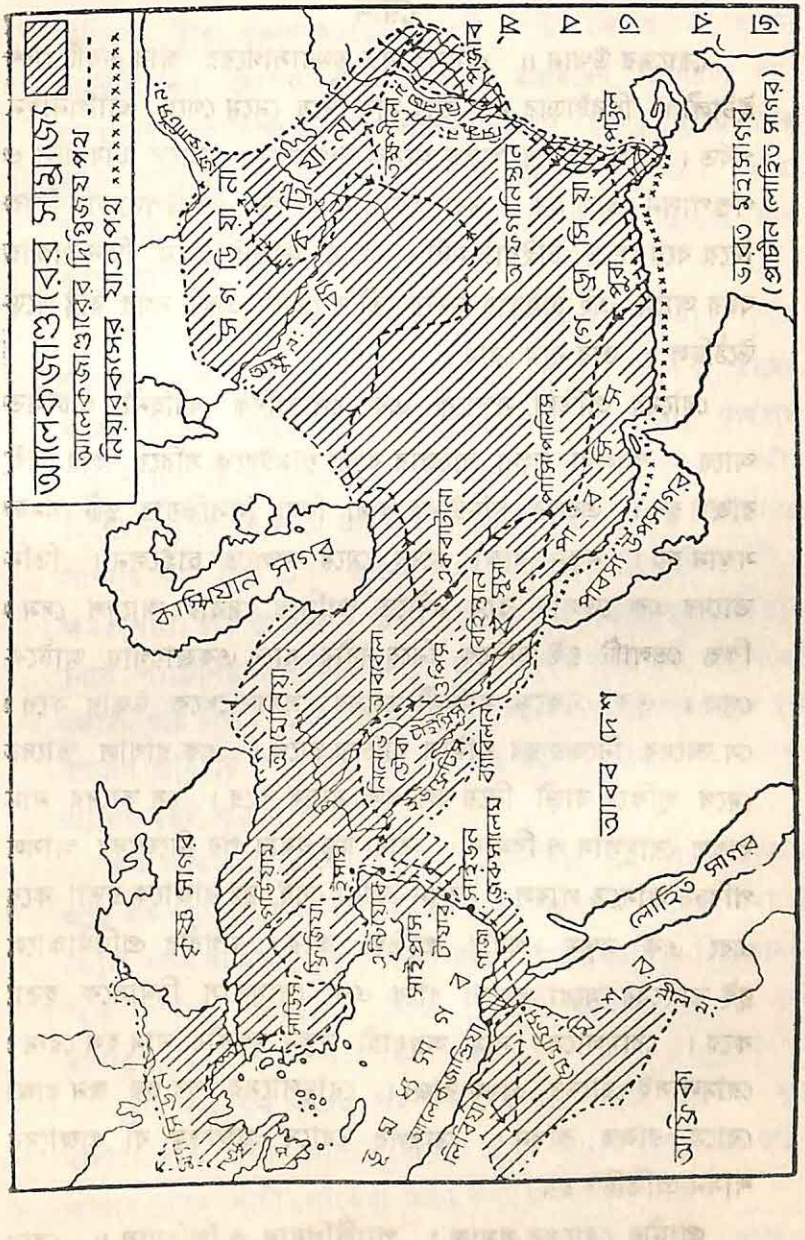
প্রথমে তিনি পারসিকদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তাদের পরাজিত করে তিনি এশিয়া মাইনর জয় করেন। তারপর টায়র, সিডন ও ব্যাবিলন প্রভৃতি খ্যাতনামা শহরগুলি তিনি অধিকার করেন। তিনি মিশর অধিকার করে সেখানে নিজের নামানুসারে বিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই শহরে তিনি একটি বড় গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। তিনি পারস্য জয় করার পর আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং আফগানিস্তান ও ব্যাকট্রিয়া জয় করেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান ॥ ৩২৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ভারত জয়ের উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন। সে সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি বিনা যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু ঝিলম নদীর পূর্বতীরের অধিপতি পুরু আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। তিনি পরাজিত হন এবং বন্দী হন। পুরুর বীরত্বে খুশি হয়ে আলেকজাণ্ডার তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

আলেকজাণ্ডারের আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হবার ইচ্ছা ছিল। সম্ভবত সমগ্র ভারতবর্ষই তিনি জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদল বহুদিন ঘরবাড়ী ছাড়া। স্বদেশে ফেরার জন্য তারা চঞ্চল হয়ে উঠল। আলেকজাণ্ডার স্বদেশে ফিরতে রাজী হলেন। একদল সৈন্য সমুদ্রপথে সেনাপতি নিয়ারকসের অধীনে ফিরে চলল। তিনি নিজে স্থলপথে ফিরে চললেন। ফেরার পথে ব্যাবিলনে তিনি জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ৩২৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মারা যান।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। মৃত্যুর সময় তাঁর কোন বংশধর ছিল না। সাম্রাজ্যের অধিকার নিয়ে তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। তাঁর সাম্রাজ্য কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যথা—ম্যাসিডন, সিরিয়া, মিশর ইত্যাদি। তাঁর সেনাপতিরাই এই রাজ্যগুলির অধিপতি হয়ে বসে।

রোমের গ্রীস জয় ॥ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ম্যাসিডনের রাজশক্তি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। ততদিন ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম ভাগে রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রোম এর পর ভূমধ্যসাগরের পূর্ব ভাগে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়। রোমানরা তখন গ্রীস, ম্যাসিডন ও অন্যান্য গ্রীকরাজ্যগুলি দখল করে বিশাল রোম সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। গ্রীক-শিল্প-সংস্কৃতি রোমানদের প্রভাবিত করেছিল।


আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য
আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় পথ
নিয়ারকসের যাত্রাপথ
কাস্পিয়ান সাগর
কৃষ্ণ সাগর
আরব দেশ
লোহিত সাগর
পারস্য উপসাগর
ভারত মহাসাগর
(প্রাচীন লোহিত সাগর)
আফ্রিকা
আফগানিস্থান
পাঞ্জাব
পার্সিপোলিস
আলেকজান্দ্রিয়া
লিবিয়া

রোম

রোমের উত্থান ।। গ্রীসের মত ভূমধ্যসাগরের আর একটি দেশ ইটালী। শিরদাঁড়ার মত তার মাঝ দিয়ে নেমে গেছে এ্যাপিনাইন পর্বত। তার দুপাশে আছে অনেক উপত্যকা। তাতে চাষ-বাস ও পশুপালন ভাল হত। মধ্য ইটালীর এরকম এক উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে গেছে টাইবার নদী। প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার বছর আগে এই টাইবার নদীর তীরে ছোট একটি নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। তার নাম রোম।

রোমের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এক পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। আলবা লংগা রাজ্যের রাজা নুমিটরকে সরিয়ে তাঁর ভাই রাজা হন। এরপর নুমিটরের কন্যা রিয়া সিলভিয়ার দুটি যমজ সন্তান হয়। নতুন রাজা এদের মেরে ফেলতে চাইলেন। তিনি তাদের এক ভেলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেবার আদেশ দেন। কিন্তু ভেলাটি দুই ভাইকে নিয়ে নদীর ধারে একজায়গায় আটকে গেল। এক নেকড়ে বাঘিনী তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে। সে তাদের নিজের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে। এক রাখাল তাদের দেখে লুকিয়ে বাড়ী নিয়ে যায় এবং মানুষ করে। সে তাদের নাম রাখল রোমুলাস ও রিমাস। তারা বড় হবার পর নিজেদের আসল পরিচয় জানতে পারল। তখন তারা সেই দুষ্ট রাজাকে হত্যা করে এবং এক নতুন নগরীর প্রতিষ্ঠা করে। নগরীর প্রতিষ্ঠাকালে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধে এবং রোমুলাস রিমাসকে হত্যা করে। রোমুলাসের নাম অনুযায়ী নতুন নগরীর নাম হল রোম। রোমুলাসই রোমের প্রথম রাজা। রোমুলাসের পর ছয় জন রাজা রোমে রাজত্ব করেন। তারপর রোমে প্রজাতন্ত্র বা প্রজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাচীন রোমের সমাজ : প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান ।। রোম রাজশাসন শেষ হল। প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল। কিন্তু দেশ শাসনের ক্ষমতা চলে যায় অভিজাত ধনীলোকদের হাতে। তাঁরা ছিলেন

জমির মালিক এবং খুব প্রভাবশালী। সবরকম সুখ, সুবিধা এবং অধিকার তাঁরা ভোগ করতেন। এই শ্রেণীর লোকেরাই ছিলেন প্যাট্রিশিয়ান। দেশের বাকী সাধারণ মানুষদের প্লিবিয়ান বলা হত। কৃষক, কারিগর ও ব্যবসাদারেরা ছিল প্লিবিয়ান। প্লিবিয়ানদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনী হয়ে ওঠে। তারা প্যাট্রিশিয়ানদের মত রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে চাইল।

দেশের শাসন কাজে প্লিবিয়ানদের অধিকার ছিল না। তারা সমাজে অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের করের বোঝা বইতে হত। যুদ্ধের সময় ঘরবাড়ী, চাষবাস প্রভৃতি সব ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধে যেতে হত। কখনও কখনও গরীব প্লিবিয়ানরা দেনার দায়ে ক্রীতদাসে পরিণত হত। কিন্তু প্লিবিয়ানরা সংখ্যায় কম ছিল না। তাদের মধ্যে অনেকেই দিনে দিনে ধনী ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং এই সংঘর্ষ বহুদিন ধরে চলে। শেষ পর্যন্ত ধনী প্লিবিয়ানরা প্যাট্রিশিয়ানদের মত সুযোগ সুবিধার অধিকারী হল। কিন্তু গরীব প্লিবিয়ানদের অবস্থা আগের মতই খারাপ রইল।

দাস প্রথা ॥ রোমের সমাজে প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান ছাড়াও আর এক শ্রেণীর লোক ছিল যাদের দাস বলা হত। তারা সমাজে কোন রকম অধিকার ভোগ করত না। প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ানরা ছিল স্বাধীন নাগরিক। কিন্তু দাসেরা স্বাধীন ছিল না এবং নাগরিকদের কোন অধিকার ভোগ করত না।

রোমানরা যুদ্ধ জয়ের পর বন্দীদের ধরে নিয়ে আসত। যুদ্ধ বন্দীরা দাস হত। বাইরে থেকেও রোমে অনেক দাস আনা হত। আবার রোমে দোষী লোকেরা কখন কখন দাসে পরিণত হত।

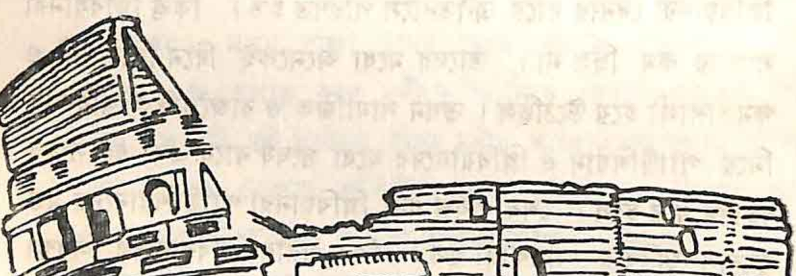
স্বাধীন নাগরিকেরা ভাল ও সম্মানের কাজকর্ম করত। দাসেরা মালিকের জমি চাষ করত; শ্রমসাধ্য সব কাজ করত। সরকারী

অফিস কাচারীতে, কারাগারে ও মন্দিরে তারা চাকরের কাজ করত।



একজন রোমান দাস

পাথরের খনিতে, রাস্তা তৈরির কাজে, মাটির তলায় নালা নর্দমা পরিষ্কারের কাজেও তাদের লাগান হত। দাসেরা অভিনয়, হাস্যকৌতুক, মল্লযুদ্ধ ও নানারকম ক্রীড়া কৌশল দেখিয়ে রোমানদের খুশি করত। দাসেরা কখনও নিজেদের মধ্যে আবার কখনও হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াই করত। দাসে-দাসে বা দাস ও পশুর লড়াইয়ে হয় দাস মরত, নরত পশু মরত। রোমানদের আমোদ ও মজার জন্যই এরকমের লড়াই হত। জীবন নিয়ে দাসেরা যখন লড়াই করত, তখন উল্লাসে ফেটে পড়ত রঙ্গমঞ্চের দর্শকেরা। এধরনের



রোমের কলোসিয়াম

লড়াই এক বিশাল রঙ্গভূমিতে অনুষ্ঠিত হত। তাকে বলা হত এম্ফিথিয়েটার। রঙ্গভূমির মাঝখানটি ছিল বৃত্তাকার। চারপাশে সারি সারি দর্শকের বসবার আসন থাকত। পরে কলোসিয়াম নামে এক বড় থিয়েটার রোমে তৈরি হয়। সেখানে নব্বই হাজার দর্শক বসতে পারত।

দাসেরা ছিল মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাদের জীবন মৃত্যু ছিল মালিকদের হাতে। তবে রোমের দাসেরা স্পার্টান দাস বা হেলটদের মত নির্যাতিত হত না। কিন্তু ক্রমাগত দাসেদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে রোমানরা একটু ভীত হয়ে পড়ল। তাদের চিন্তা হল যে, দাসেরা ষড়যন্ত্র করে দেশে যে কোন রকমের বিপদ ঘটাতে পারে। তাদের ভাবনা খুব মিথ্যা ছিল না। দাসেরা সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘটাতে শুরু করল। ইউনুস নামে এক দাস নেতার নেতৃত্বে সিসিলিতে বিদ্রোহ হয়। ট্রাইফো ও এ্যাথেনিওর নেতৃত্বে সিসিলিতে আবার বিদ্রোহ হয়। কিন্তু ইটালীতে সবচেয়ে বড় রকমের দাস বিদ্রোহ হয় স্পার্টাকাস নামে এক সুযোগ্য দাস নেতার নেতৃত্বে।

স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ॥ ইটালীতে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস বিদ্রোহ এক বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম। খ্রীস্টজন্মের ৭৩ বছর আগে এই বিদ্রোহ শুরু হয় এবং দু' বছর ধরে চলে। ইটালীর কাপুয়া শহরে মল্লযোদ্ধাদের এক আখড়ায় প্রায় ২০০ জন দাস বিদ্রোহের গোপন সিদ্ধান্ত নেয়। একথা জানাজানি হয়ে যায়। ৮০ জনের মত দাস পালিয়ে যায়। তারা বিসুবিয়াস পর্বতে এসে জড় হয় এবং স্পার্টাকাসকে নেতা নির্বাচিত করে।

স্পার্টাকাস ছিলেন যোগ্য নেতা। তাঁর নেতৃত্বে তাঁর দল ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠল। দেরী না করে রোমানরা তাঁর বিরুদ্ধে এক সৈন্যদল পাঠায়। রোমানরা স্পার্টাকাসের বুদ্ধি ও কৌশলের কাছে হেরে যায়। এরপর স্পার্টাকাসের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। বহু দাস তাঁর দলে যোগ দেয়। প্রায় সমস্ত দক্ষিণ ইটালী স্পার্টাকাস দখল করে নেন। তারপর স্পার্টাকাস উত্তর ইটালী অভিযান করেন। মিউটিনা শহরের কাছে এক বিখ্যাত যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। এবার স্পার্টাকাস রোমের দিকে অগ্রসর হন। রোমের সব লোক খুব ভয় পেয়ে যায়। স্পার্টাকাস কিন্তু রোম আক্রমণ না করে দক্ষিণ ইটালীর দিকে চললেন। হয়তো সিসিলিতে চলে যাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। এ সময়ে রোমান সেনাপতি ক্রেসাসের সঙ্গে

তাঁর এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণ দেন। তারপর রোমানরা নির্মম ভাবে দাস বিদ্রোহ দমন করে। কাপুয়া থেকে রোম পর্যন্ত পথের উপরে ছয় হাজার দাসকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

রোমের সাম্রাজ্য বিস্তার।। প্রথমে রোম ছিল ছোট একটি নগর রাষ্ট্রের মত। পরে রোমের কর্তৃত্ব সমস্ত ইটালীতে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্রাজ্য একবার বাড়তে আরম্ভ করলে তা সহজে থামে না। ভূমধ্যসাগরের চারপাশের দেশগুলির উপরে রোমানদের এবার দৃষ্টি পড়ল।

কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ।। এ সময়ে উত্তর আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরের তীরে কার্থেজ নামে এক শক্তিশালী নগর ছিল। ব্যবসাবাণিজ্য করে কার্থেজ খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমভাগে তাদের কর্তৃত্ব ছিল।

ইটালীর দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপ। সিসিলির পশ্চিমভাগ ছিল কার্থেজের অধীন। সিসিলির উপর রোম পরিপূর্ণ অধিকার স্থাপন করতে চাইল। তখন রোমের সঙ্গে কার্থেজের যুদ্ধ বাধে। রোম ও কার্থেজের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধে তা দীর্ঘ ১১৯ বছর ধরে চলে। কার্থেজের সঙ্গে রোমের তিনটি বড় যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধগুলি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ নামে খ্যাত। পিউনিক বলতে কার্থেজীয়দের বোঝাত।

কার্থেজের অধিবাসীরা জলযুদ্ধে খুবই পারদর্শী ছিল। কিন্তু রোমের কোন ভাল নৌবাহিনী ছিল না। রোমানরা খুব তাড়তাড়ি একটি ভাল নৌবাহিনী গড়ে তুলল। শক্তিশালী কার্থেজীয় নৌবাহিনী তাদের বুদ্ধি ও কৌশলের কাছে পরাজিত হয়। প্রথম পিউনিক যুদ্ধে রোম জয়লাভ করে এবং সিসিলি দখল করে।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধের পর কার্থেজ খুব অর্থাভাবে পড়ে। এই অর্থাভাব দূর করার জন্য হ্যামিলকার বার্কা নামে এক সেনাপতি স্পেনে যান। তিনি সেখানে গিয়ে এক শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী

গড়ে তোলেন। তাঁর পুত্র হ্যানিবল আলেকজাণ্ডারের মত এক বীর যোদ্ধা হয়ে উঠলেন। শোনা যায় তিনি ছেলেবেলায় বাবার কাছে শপথ করেছিলেন যে তিনি আজীবন রোমের শত্রুতা করবেন। স্পেন থেকে হ্যানিবল রোমের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করেন এবং ইটালীর উত্তরে আল্পস পর্বত অতিক্রম করেন। হ্যানিবল আল্পস অতিক্রম করবেন, একথা রোমানরা কল্পনাও করতে পারে নি। রোমানরা ভাল যোদ্ধা ছিল। কিন্তু এরপর যোগ্য নেতার অভাবে তারা একের পর এক যুদ্ধে হ্যানিবলের কাছে হেরে যেতে লাগল। ক্যানের যুদ্ধে রোমানরা সাংঘাতিক ভাবে হেরে যায়। সিসিলির একটি জায়গার নাম সাইরাকিউজ। এই সময়ে সাইরাকিউজ রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সাইরাকিউজের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস তখন জীবিত ছিলেন। সাইরাকিউজ এবং সিসিলিকে দখলে রাখার জন্য রোম খুব যুদ্ধ করে। তবে তার আসল উদ্দেশ্য ছিল হ্যানিবলকে পরাজিত করা এবং কার্থেজকে ধ্বংস করা। রোমানরা এক নতুন মতলব করে। হ্যানিবল তখন ইটালীতে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত, এই সুযোগে রোমানরা কার্থেজ আক্রমণের জন্য সিপিও নামে এক সেনাপতিকে পাঠায়। সিপিওর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে হ্যানিবল দ্রুত কার্থেজে ফিরে যান। সিপিও জামার বিখ্যাত যুদ্ধে হ্যানিবলকে পরাজিত করেন। হ্যানিবলের জীবনে এই প্রথম পরাজয়। এই বীর সমর নায়কের শেষ জীবন বড়ই করুণ। তিনি রোমানদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বিষপানে আত্মহত্যা করেন। জামার যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধের পর রোম স্পেনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। পঞ্চাশ বছর বাদে কার্থেজ তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধে রোমানদের হাতে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। রোম ধীরে ধীরে সমস্ত ভূমধ্যসাগরের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

এই ভাবে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে রোম সাম্রাজ্য বড় হতে লাগল। রোমে সেনেট নামে এক সভা দেশের শাসন কাজ চালাত। রোমান

সেনেটের পক্ষে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই সময়ে রোমে পর পর কয়েকজন শক্তিশালী নেতা বা ডিক্টেটরের আবির্ভাব হয়। এঁরা সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে খুশিমত দেশ শাসন করতেন। জুলিয়াস সীজার এমন একজন ডিক্টেটর ছিলেন।

জুলিয়াস সীজার ।। খ্রীস্ট জন্মের ঠিক একশ বছর আগে জুলিয়াস সীজার রোমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বড় যোদ্ধা ছিলেন। ব্রিটেন ও গল জয় করার পরে তিনি রোমের উপরে তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এরপরে সীজার মিশর, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনর জয় করেন। এই বিপুল জয়ের সংবাদ তিনি রোমে পাঠান। সংবাদে মাত্র তিনটি কথা ছিল যা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে—'Veni, vici, vidi"—যার মানে "আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জয় করলাম।" রোমে ফিরে তিনি সমস্ত সাম্রাজ্যের প্রধান হলেন। তিনি রাজা বা সম্রাট হলেন না। রোমানরা তাঁকে সারাজীবনের জন্য ডিক্টেটর করল। সীজার সুশাসক ছিলেন। রোমানদের কাছে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু ব্রুটাস প্রভৃতি কয়েকজন প্রভাবশালী রোমান মনে করলেন যে, সীজার এরপর প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করে নিজে সম্রাট হবেন। তাঁরা গোপন চক্রান্ত করে সীজারকে হত্যা করেন।


জুলিয়াস সীজার

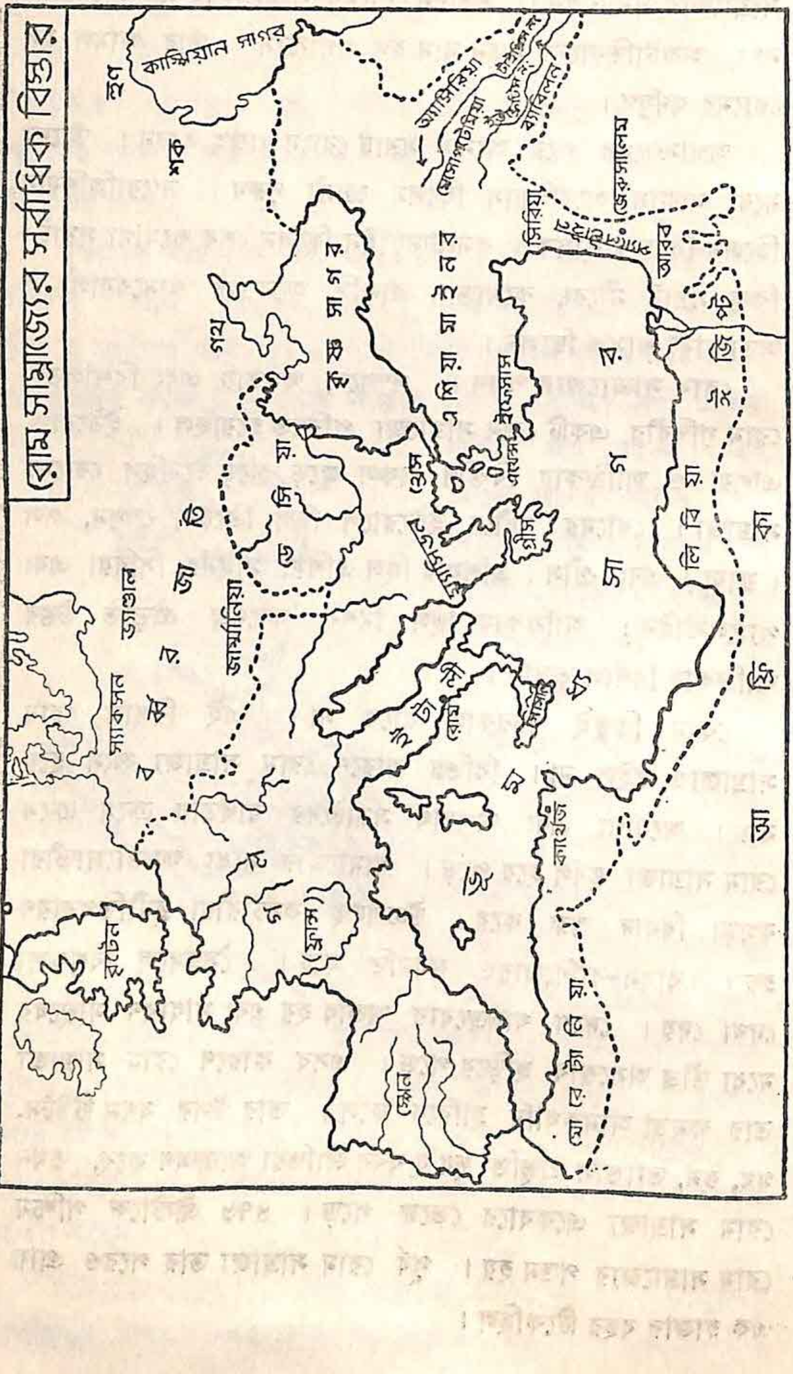
সীজারের মৃত্যু হল, কিন্তু প্রজাতন্ত্র রক্ষা পেল না। সীজারের পোষ্যপুত্র অকটাভিয়ান সীজারের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই রোম

সাম্রাজ্যের সম্রাট হন। এতদিন রোমের সাম্রাজ্য ছিল, সম্রাট ছিল না। অকটাভিয়ানের নতুন নাম হল অগাস্টাস। তাঁর আমল হল রোমের স্বর্ণযুগ।

অগাস্টাসের পরে অনেক সম্রাট রোমে রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যে মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন জ্ঞানী পুরুষ। ডায়োক্লিশিয়ান ছিলেন বিচক্ষণ শাসক। কনস্টানটাইন ছিলেন শেষ সুযোগ্য সম্রাট। কিন্তু সম্রাট নীরো, কমোডাস প্রভৃতি অনেকেই খামখেয়ালী ও অত্যাচারী শাসক ছিলেন।

রোম সাম্রাজ্যের পতন ।। সম্পদে, ক্ষমতায় এবং বিশালতায় রোম পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল রোমের সাম্রাজ্য। রোমের অধীনে ইউরোপে ছিল ব্রিটেন, স্পেন, গল (ফ্রান্স) এবং গ্রীস; এশিয়ায় ছিল এশিয়া মাইনর, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন; আফ্রিকায় ছিল মিশর, কার্থেজ প্রভৃতি উত্তর আফ্রিকার বিশাল ভূভাগ।

কোন কিছুই চিরকাল থাকে না। এই বিশাল রোম সাম্রাজ্যও রইল না। বিভিন্ন কারণে রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। অযোগ্য এবং অপদার্থ সম্রাটদের ব্যর্থতায় ক্রমে ক্রমে রোম সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। সামাজ্যের মধ্যে ক্ষমতালোভীরা ঝগড়া বিবাদ শুরু করে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অবনতি ঘটে। সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এসব কারণে রোম সাম্রাজ্য তার ক্ষমতা অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। তার উপর যখন টিউটন, গথ, হুন, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি দুর্ধর্ষ বর্বর জাতিরা আক্রমণ করে, তখন রোম সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য তার পরেও প্রায় এক হাজার বছর টিকেছিল।


রোম সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার
কাস্পিয়ান সাগর
হূণ
শক
আসিরিয়া
মেসোপটেমিয়া
ব্যাবিলন
জেরুসালেম
সিরিয়া
আরব
কৃষ্ণ সাগর
এশিয়া মাইনর
থ্রেস
গ্রীস
জার্মানিয়া
স্যাকসন
ব্রিটেন
(ফ্রান্স)
স্পেন
রোম
কার্থেজ
লিবিয়া

খ্রীস্টধর্মের উদ্ভব ॥ অগাস্টাস যখন রোমের সম্রাট তখন খ্রীস্ট ধর্মের প্রবর্তক মহামানব যীশু জুডিয়ার বেথলহেমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীন। সেখানে ছিল ইহুদীদের বাস।

যীশুর মা ছিলেন মেরী এবং বাবার নাম জোসেফ। জোসেফ ছুতোরের কাজ করতেন। বড় হয়ে যীশু বাবার পেশাই ধরলেন। তিনি সহজ, সরল ও পবিত্রভাবে দিন যাপন করতেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করেন।

যীশু সাধারণ মানুষের কাছে ছোট ছোট গল্প বলে উপদেশ দিতেন। সকলকে ভালোবাসা, পাপীকে ক্ষমা করা, কোন কিছুতে লোভ না করা, পবিত্রজীবন যাপন করা এবং এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করা প্রভৃতি তাঁর প্রধান উপদেশ। সাধারণ মানুষ তাঁর কথা ও উপদেশ খুব আগ্রহ করে শুনত এবং সে সব কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত। তারা মনে করত তিনি মুক্তিদাতা। রোমের শাসন ও অত্যাচার থেকে তিনি মুক্তি দেবেন। তিনি গরীব, দুঃখী ও শোকাতুর মানুষের বন্ধু ছিলেন। তাঁর প্রচার ছিল সমাজের ধনী, ভণ্ড ও দুষ্ট লোকেদের বিরুদ্ধে। একারণে বহু ইহুদী তাঁকে সহ্য করতে পারল না। সেখানকার রোমের শাসক পন্টিয়াস পিলেটের কাছে তারা অভিযোগ করে যে, সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বাড়িয়ে তিনি রাজা হতে চান। রোমের শাসক তখন যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার আদেশ দেন। তেত্রিশ বছর বয়সে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যীশু দেহত্যাগ করেন।

যীশু তাঁর ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য ১২ জন এ্যাপোস্‌ল্ বা জ্ঞানী পুরুষ ঠিক করেছিলেন। তাঁরা তাঁর মৃত্যুর পর খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য বেরিয়ে পড়েন। যীশুকে তাঁর শিষ্যরা খ্রীস্ট বলত। খ্রীস্ট মানে ত্রাণকর্তা। খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসীরা খ্রীস্টান বলে পরিচিত হল। খ্রীস্টানরা রোম সম্রাটদের ভজনা করত না। রোম সম্রাটদের কাছে

এটা বিশ্বাসঘাতকতার সামিল এবং এর শাস্তি মৃত্যু। সেজন্য খ্রীস্টানরা গোপনে গোপনে ধর্ম প্রচার করত এবং ধর্ম পালন করত। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল খ্রীস্টানরা অত্যাচার ও মৃত্যুকে তুচ্ছ করে প্রকাশ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে শুরু করে। রোমের শাসকগণ খ্রীস্টধর্মকে দমন করতে ব্যর্থ হয়। খ্রীস্টধর্মের শক্তি রোমের শাসকের অস্ত্র-শক্তির থেকে অনেক বড় ছিল। রোম সম্রাট কনস্টানটাইন যখন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন, তখন রোম সাম্রাজ্য জুড়ে খ্রীস্টধর্মের প্রসার ঘটে। খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থ হল বাইবেল।

শুনতে অবাক লাগলেও একথা সত্য যে, রোমানরা যখন খ্রীস্ট-ধর্মকে গ্রহণ করে নি এবং ইংলণ্ড ও পশ্চিম ইউরোপে যখন এ ধর্ম প্রসার লাভ করে নি, তখন কিন্তু খ্রীস্টধর্ম দক্ষিণ ভারতে প্রচারিত হয়েছিল এবং এই প্রচার হয় খ্রীস্টজন্মের একশ বছরের মধ্যেই।

চীন

হোয়াংহো নদী বিধৌত উত্তর চীনের সমতল ভূমিতে প্রাচীন চীনের সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। কিছুকাল আগে পর্যন্ত চীন সম্পর্কে যা জানা যেত তার অনেকটাই পৌরাণিক গল্প ও লোকগাথা। কিন্তু কয়েক বছর আগে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে ব্রোঞ্জযুগে উত্তর চীনে এক উন্নত সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল।

শাং রাজবংশ ॥ এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে চীনে শাং রাজবংশ রাজত্ব করে।

চীনের উত্তরে বাস করত কয়েকটি দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি। সর্বদাই তাদের আক্রমণের ভয় ছিল। এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য যীন নামে এক উপজাতির প্রচেষ্টায় চীনা উপজাতিরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং পরে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র স্থাপন করল। তার নাম হল শাং। এ ভাবেই শুরু হল চীনে শাং-য়ীন যুগ।

শাং যুগে চীনের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি-কাজ। বার্লি, জোয়ার, গম প্রচুর ফলত। পরে ধানের চাষ শুরু হয়। তারা রেশম প্রস্তুত করতে পারত। অনেকে পশু পালনের কাজ ও মৎস্য শিকারের কাজ করত।


চীনের ব্রোঞ্জের পাত্র

কারিগরী বিদ্যায় তারা যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। কাঠ দিয়ে তারা নৌকা ও রথ তৈরি করত। অস্ত্রশস্ত্র ও বিলাস ব্যসনের সব উপকরণ ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করত। গাড়ীর চাকা করত ব্রোঞ্জ দিয়ে। মাটি, পাথর ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তারা সুন্দর সুন্দর কারুকার্য করা পাত্র তৈরি করত। ব্যবসা বাণিজ্য চলত লেনদেনের মাধ্যমে।

চৌ রাজবংশ ॥ শাং রাজবংশের পরে চৌ রাজবংশের রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। চৌ যুগেই চীনে প্রথম লোহার ব্যবহার শুরু হয়। তার ফলে চীনের দেশ ও সমাজে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। আর এই যুগেই চীনে শিল্প, সাহিত্য, দর্শনে অভূত-পূর্ব উন্নতি হয়েছিল। কনফুসিয়াসের মত মহাপুরুষ এই সময়েই জন্মগ্রহণ করেন।

কনফুসিয়াস ॥ ৫৫১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে কনফুসিয়াস চীনের লু নামে একটি ছোট রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান এবং দুঃখ কষ্টে বড় হন। তিনি প্রথম জীবনে ইতিহাস, সঙ্গীত ও ধনুর্বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁর চেহারা সুন্দর ছিল না।

তিনি বড় হয়ে দেখলেন যে, চীনে চৌ রাজবংশের দুর্বল শাসনে

দেশময় অশান্তি এবং অরাজকতা। তার উপর ছিল উত্তর দিক থেকে



কনফুসিয়াস

বর্বরদের আক্রমণ। তার ফলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার সীমা ছিল না। মাতৃভূমির এই শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং এর থেকে মুক্তির চিন্তায় ব্যাকুল হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সাধারণ মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটলেই দেশ ও সমাজের উন্নতি হবে; নৈতিক অধঃপতনই সকল দুঃখ কষ্টের কারণ।

তিনি নৈতিক শিক্ষা প্রচারের জন্য নিজ রাজ্য লু-তে একটি বিদ্যালয় খোলেন। তাতে তিনি নিজেই শিক্ষকতা করতেন। প্রাচীন ইতিহাস, কাব্য, আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে তিনি মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। দিনে দিনে তাঁর ভক্ত ও শিষ্যের দল বাড়তে লাগল।

একবার তিনি লু রাজ্যের চুংতু শহরের শাসক নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনে সেই শহরের মানুষদের খুবই উন্নতি হয়েছিল। কিছুদিন পর সেই রাজ্যের সামন্তরাজার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। এর পরে তিনি শিষ্যদের দিয়ে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন এবং তাঁর উপদেশগুলি প্রচার করেন।

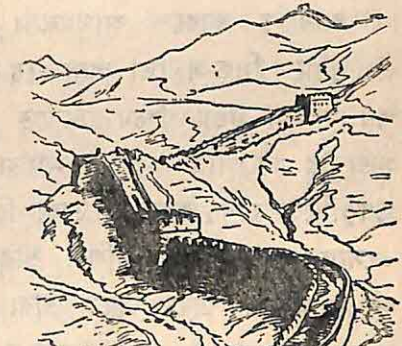
কনফুসিয়াসের উপদেশের মূল কথা হল, প্রাচীন প্রথা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে; নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং সৎ মানুষ হতে হবে; সংযম, ধৈর্য এবং নিজের ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে মনের শান্তি লাভ হবে; রাজা যদি রাজার মত, পিতা যদি পিতার মত, পুত্র যদি পুত্রের মত ব্যবহার করে এবং দেশের

মানুষ যদি রাজ্যের রীতিনীতি মেনে চলে তবে দেশে সুখ, শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিরাজ করবে।

কনফুসিয়াস একজন বড় চিন্তানায়ক ছিলেন। তিনি কোন নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন নি। তিনি কতকগুলি নৈতিক ও সামাজিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করেন। তবে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে চীনবাসীরা বহু মন্দির তৈরি করে এবং তাঁর উপদেশগুলি চীনের সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মের রূপ নেয়।

৪৭৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে কনফুসিয়াস দেহত্যাগ করেন।

চিন্ রাজবংশ ।। চৌ রাজবংশের পর চিন্ রাজবংশ চীনে রাজত্ব করে। চিন্ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন শি হুয়াংতি। তিনি সমগ্র চীনকে তাঁর শাসনের অধীনে আনেন। দেশের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি নানাপ্রকার সংস্কার করেন। বিখ্যাত চীনের প্রাচীরের কাজ তাঁর সময়েই শুরু হয়।


চীনের প্রাচীর

শি হুয়াংতি ছিলেন অহঙ্কারী ও অত্যাচারী শাসক। তাঁর শাসনে প্রজারা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। কনফুসিয়াসের শিষ্যরা রাজার অত্যাচারের প্রতিবাদ করে এবং প্রজাদের সমর্থন করে। এর ফলে রাজা কনফুসিয়াসের শিষ্যদের উপর ক্ষিপ্ত হন এবং তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেন। তাদের রচিত ইতিহাস এবং কনফুসিয়াসের উপদেশাবলী পুড়িয়ে ধ্বংস করেন। শি হুয়াংতির মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই চিন্ শাসনের পতন হয়।

চীনের বিশাল প্রাচীর ।। চীনের উত্তর-পশ্চিমে বাস করত

অনেকগুলি বর্বর যাযাবর জাতি। তারা প্রায়ই চীনের শহর ও গ্রামে এসে হানা দিত। তাই চীন দেশের সুরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিককে চীনের উত্তর সীমান্তে এনে কাজে লাগানো হল। তারা ইট তৈরি করল, মাপে মাপে পাথর কাটল, তারপর বিরাট প্রাচীর ও মাঝে মাঝে গম্বুজ তৈরি করল। অনেক বছর ধরে এ কাজ চলেছিল। এ ভাবে উত্তর সীমান্ত বরাবর চীনারা ৪ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলল। প্রাচীরটি বেশ চওড়া ছিল। তার উপর দিয়ে পাঁচ ছয়জন ঘোড়সওয়ার অনায়াসেই পাশাপাশি যেতে পারত।

ভারত

আর্যদের ভারতে আগমন।। আনুমানিক দেড় হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। সিন্ধু সভ্যতার পতনের পর আর্যরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতে আর্য সভ্যতার সূত্রপাত করে। আর্যরা খুব সম্ভবত দক্ষিণ রাশিয়ার তৃণভূমিতে বাস করত। তারা হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতে এসেছে। তারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে বা সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ক্রমে ক্রমে তারা পূর্ব ও দক্ষিণে প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে। বাধা আসে অনার্যদের কাছ থেকে। অনার্যরা ছিল কৃষ্ণকায়, তাদের ভাষা ও ধর্ম ছিল আর্যদের থেকে আলাদা। আর্যরা ছিল শক্তিশালী। অনার্যরা আর্যদের কাছে হেরে বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। কেউ কেউ আবার আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করে এবং দাস রূপে আর্য সমাজে আশ্রয় লাভ করে। ক্রমে ক্রমে গাঙ্গেয় উপত্যকা হয় আর্য সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ভূমি।

বৈদিক সাহিত্য।। হিন্দুদের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। হিন্দুদের বিশ্বাস, বেদ ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত বাণী, তাই বেদ অপৌরুষেয়। বেদ লিখিত সাহিত্য ছিল না। ঋষিরা মুখে মুখে বেদ রচনা করেন। গুরুর কাছে শুনে শিষ্য বেদ মুখস্থ করে নিতেন।

তিনি আবার তাঁর শিষ্যদের বেদ শোনাতেন। তাই বেদের আর এক নাম শ্রুতি। বেদ কথাটির অর্থ জ্ঞান।

বেদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বৈদিক সাহিত্য। সমগ্র বৈদিক সাহিত্য চার ভাগে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। সংহিতা সংখ্যায় চারটি—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। ঋগ্বেদ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। পরবর্তী কালে বেদান্ত দর্শন বা ষড় দর্শন এবং বেদাঙ্গ বা স্মৃতি সাহিত্যে রচিত হয়। বিশাল বৈদিক সাহিত্য এক যুগের সৃষ্টি নয়, বহু শতাব্দী ধরে রচিত হয়েছিল।

বৈদিক যুগের সমাজ ॥ আর্যরা জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি ও পশুপালনের উপর নির্ভর করত। আদি বৈদিক সমাজ গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। আর্য সমাজের মূল কেন্দ্র ছিল পরিবার। প্রতি পরিবারের প্রধান ছিলেন পিতা। আর্য সমাজ ছিল পুরুষ প্রধান। সমাজে নারীর পূর্ণ মর্যাদা ছিল। তারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা, ঘোষা, অপলা প্রভৃতি বিদুষী মহিলারা এই যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আর্য সমাজে প্রথমে শ্রেণীভেদ ছিল না। প্রত্যেক মানুষ বৃত্তি গ্রহণ করত তার যোগ্যতা অনুযায়ী। বৃত্তিকে কেন্দ্র করে শ্রেণীভেদের উদ্ভব হয়। বৃত্তি ও কর্মের উপর নির্ভর করে বৈদিক সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যারা যাগ-যজ্ঞ, পূজা-পার্বণ ও পড়াশুনা নিয়ে থাকত, তাদের বলা হত ব্রাহ্মণ। দেশরক্ষা ও রাজ্যশাসনের কাজ ছিল ক্ষত্রিয়দের। বৈশ্যদের কাজ ছিল ব্যবসা বাণিজ্য করা। আর কৃষ্ণকায় অনার্যরা ছিল শূদ্র শ্রেণীভুক্ত। তারা সমাজে চাকরের কাজ করত।

বৈদিক ধর্ম ॥ আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে দেবদেবী জ্ঞানে পূজা করত। তাদের বজ্র ও মেঘের দেবতা হলেন ইন্দ্র। জলের দেবতা বরুণ। সূর্য হলেন আলোর দেবতা, ঝড়ের দেবতা মরুৎ, আর অগ্নি হলেন আগুনের দেবতা। এ ছাড়াও মিত্র, বিষ্ণু, রুদ্র,

পৃথিবী, সোম, উষা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। প্রথমে আর্যদের পূজা পদ্ধতি ছিল খুবই সহজ ও সরল। কিন্তু পরবর্তী কালে আর্যদের ধর্মানুষ্ঠানে জটিলতা আসে এবং পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ক্রমে ক্রমে পুরোহিতেরা সমাজে খুবই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। আর্যরা প্রথমে মূর্তিপূজা করত না। পরে অনার্যদের সংস্পর্শে এসে তারা মূর্তিপূজা আরম্ভ করে।

বৈদিক যুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থা।। সমাজ ব্যবস্থার মত রাষ্ট্র ব্যবস্থারও ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের প্রধানকে বলা হত গৃহপতি। কয়েকটি পরিবারকে নিয়ে গড়ে উঠত একটি গ্রাম। আবার কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে গড়ে উঠত একটি বিশ বা জন। গ্রামের প্রধানকে বলা হত গ্রামণী এবং বিশ বা জনের প্রধানকে বিশপতি বা রাজন।

বৈদিক যুগের প্রথমে যোগ্যতম ব্যক্তিকে রাজপদে নিয়োগ করা হত। পরবর্তী কালে রাজপদ গ্রহণ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা ও সমিতি নামে দুটি সংস্থা রাজকার্য পরিচালনায় সাহায্য করত। রাজা পুরোহিত ও সেনানীর পরামর্শ নিতেন। রাজার প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রজার মঙ্গল সাধন এবং নিরাপত্তা রক্ষা করা।

মহাকাব্য ঃ রামায়ণ।। খ্রীস্টজন্মের প্রায় সাতশো থেকে হাজার বছর আগে বৈদিক যুগের কয়েকটি ঘটনাকে নিয়ে রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুটি রচিত হয়েছে। মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন। অযোধ্যার রাজা দশরথের প্রথম পুত্র ছিলেন রাম। রাম ভগবানের দশ অবতারের এক অবতার। রামের কাহিনী অবলম্বনে রামায়ণ রচিত।

মহাকাব্য ঃ মহাভারত।। ব্যাস মহাভারত মহাকাব্য রচনা করেন। হস্তিনাপুরের রাজা বিচিত্র-বীর্যের ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু নামে দুই পুত্র ছিল। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলে পাণ্ডু রাজা হন। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব নামে পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের ছিল একশ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দুর্যোধন। ধৃতরাষ্ট্রের

পুত্ররা কৌরব এবং পাণ্ডুর পুত্ররা পাণ্ডব নামে পরিচিত। তাদের কাহিনী নিয়ে মহাভারত রচিত।

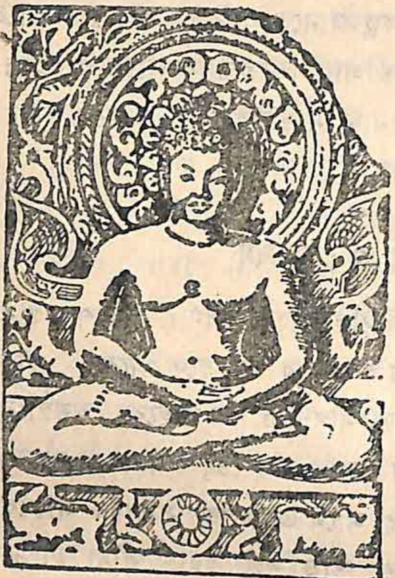
রামায়ণ ও মহাভারত এ দুটি মহাকাব্য থেকে আমরা তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। রামায়ণে আছে অনার্যদের বাসভূমি দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তারের ইতিহাস। মহাভারতে আছে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলনের ফলে ভারতে নতুন সভ্যতার সৃষ্টির ইতিহাস।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম

বেদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বৈদিক ধর্ম। ক্রমশ এই ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে অসন্তোষ জমা হতে থাকে। কারণ বৈদিক ধর্ম বলতে তখন বোঝাত যাগ-যজ্ঞ ও বাইরের অনুষ্ঠানের প্রাধান্য। মানুষের মনে প্রশ্ন এল, যাগ-যজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠান—এই কি ধর্ম? তাছাড়া ধর্মের নামে ব্রাহ্মণেরা সাধারণ মানুষের উপরে যে অত্যাচার চালাত, তাও সহ্য করার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মানুষ চাইল অত্যাচারহীন সমাজে সৎ জীবনযাপন করতে। এই অবস্থার প্রতিকার করতে জন্মগ্রহণ করেন দুই মহাপুরুষ, মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ।

জৈন ধর্ম ॥ সাধারণভাবে মহাবীর জৈনধর্মের প্রবর্তক বলে পরিচিত। কিন্তু জৈনদের মতে মহাবীরের পূর্বে আরও তেইশজন তীর্থঙ্কর (ধর্ম প্রবর্তক) জৈন ধর্ম প্রচার করেন। মহাবীর হলেন শেষ তীর্থঙ্কর। খ্রীস্ট জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে উত্তর বিহারের বৈশালী নগরের এক ক্ষত্রিয় বংশে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ, মাতার নাম ত্রিশলা। তিনি এক ক্ষত্রিয় রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁর নাম যশোদা। তাঁদের এক কন্যা জন্ম লাভ করে। কিন্তু ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বার বছর ধরে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের

পরে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। এই সময় হতে তিনি জিন বা ইন্দ্রিয়জয়ী এবং মহাবীর নামে পরিচিত হন। এই জিন আখ্যা থেকেই তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের নাম হয় জৈন ধর্ম। সিদ্ধি লাভের পরে তিনি ভারতের বহুস্থান পর্যটন করে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। ৭২ বছর বয়সে তিনি দক্ষিণ বিহারের পাবা নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন।



মহাবীর

অহিংসা, সত্য কথা বলা, চুরি না করা ও পরদ্রব্যে লোভ না করা—এই চারটি নীতিকে জৈন ধর্মে চতুর্যাম বলে। এগুলিই হল জৈন ধর্মের মূল কথা। জৈনদের বলা হয় নির্গ্রন্থ। যার কোন বন্ধন নেই তিনিই নির্গ্রন্থ। তাই জীবনে সকল বন্ধন ও আসক্তি থেকে মুক্তিলাভ করাকেই জৈনরা নির্গ্রন্থ বলে। কর্মফল ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পেতে হলে সিদ্ধশীল হতে হবে। ত্রিরত্ন পালন করতে পারলেই সিদ্ধশীল হওয়া যায়। ত্রিরত্ন হল সঠিক বিশ্বাস, সঠিক জ্ঞান, সঠিক আচরণ। জৈনরা অহিংসা নীতিকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়। জীবজন্তু হত্যা করাকে তারা মহাপাপ বলে মনে করে। জৈন ধর্ম ভারতের বাইরে ছড়িয়ে যায় নি। ভারতের মধ্যে গুজরাট, রাজস্থান ও মহীশূরে এই ধর্ম খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

বৌদ্ধধর্ম ॥ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধের বাল্যকালে নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তিনি হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবস্তুর শাক্য রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শুদ্ধোদন ও মাতার নাম মায়াদেবী। কপিলবস্তুর নিকট লুম্বিনী

গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ষোল বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম গোপা বা যশোধারা। তাঁর একটি পুত্র জন্মলাভ করে, নাম তার রাহুল। ভোগ বিলাসের মধ্যেই তিনি বড় হচ্ছিলেন। কিন্তু জীবনের দুঃখ, কষ্ট, মৃত্যু তাঁর মনে বৈরাগ্য আনে। উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি স্ত্রী, পুত্র এবং রাজ ঐশ্বর্যের মায়া কাটিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ছয় বছর ধরে তিনি বৈশালী, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে উপদেশ লাভ করেন। কিন্তু সত্যের সন্ধান পেলেন না। অবশেষে গয়ার কাছে উরুবিল্ব নামে এক জায়গায় অশ্বত্থ গাছের তলায় তিনি গভীর ভাবে ধ্যান মগ্ন হলেন। এখানেই তিনি পরম দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। তিনি বুদ্ধ (পরম জ্ঞানী), তথাগত (যিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন) এবং শাক্যমুনি নামে পরিচিত হন। তাঁর বোধি বা জ্ঞান লাভের স্থানটি বুদ্ধগয়া নামে খ্যাত।



গৌতম বুদ্ধ

সিদ্ধিলাভের পর বুদ্ধদেব সারনাথে সর্বপ্রথম তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। তারপর বাকী জীবন তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করেই কাটিয়ে দেন। বহু সাধারণ মানুষ তাঁর ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। অনেক রাজাও তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। আনুমানিক ৪৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আশী বছর বয়সে তিনি কুশী নগরে নির্বাণ লাভ করেন। তাঁর তিরোধান বৌদ্ধশাস্ত্রে 'মহাপরিনির্বাণ' নামে খ্যাত।

জগতের দুঃখ কষ্ট থেকে মানুষের নির্বাণ বা মুক্তি লাভের পথ দেখানই বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বুদ্ধ তাঁর

শিষ্যদের কাছে চারটি মহাসত্যের ব্যাখ্যা করেছেন যা 'আর্যসত্য' নামে পরিচিত। সত্যগুলি হল—সংসারে দুঃখ কষ্ট আছে, দুঃখ কষ্টের কারণ আছে, এই দুঃখ কষ্টের অবসান করতে হবে এবং এই দুঃখ কষ্ট দূর করবার সত্য পথ আছে। এই সত্য পথ লাভের জন্য তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন, যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সৎ সঙ্কল্প, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ জীবন, সৎ চেষ্টা, সৎ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

বৌদ্ধগণ পশুবলি ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিল। অহিংসা এবং সর্বজীবে দয়া বৌদ্ধধর্মের মূলকথা। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটক পালিভাষায় লেখা।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধগণ হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মূর্তিপূজার বিরোধীরা হীনযান এবং মূর্তিপূজার সমর্থকরা মহাযান নামে পরিচিত।

ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের যুগ

মগধ সাম্রাজ্য ॥ বর্তমান বিহার প্রদেশের পাটনা ও গয়া অঞ্চল প্রাচীনকালে মগধ নামে পরিচিত ছিল। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সেখানে কয়েকটি রাজবংশ পরপর রাজত্ব করেছিল।

হর্যঙ্ক বংশ ॥ হর্যঙ্ক বংশের উল্লেখযোগ্য অধিপতি ছিলেন বিম্বিসার। তাঁর সময় থেকেই মগধে গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। তাঁর রাজধানী ছিল রাজগৃহ।

বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা অথবা বন্দী করে সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি বৈশালী জয় করেন।

অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ীর আমলে রাজধানী হল পাটলিপুত্র।

শৈশুনাগ বংশ ॥ হর্যঙ্ক বংশের শেষ সম্রাট ছিলেন নাগদাসক। নাগদাসককে শিশুনাগ নামে তাঁর এক মন্ত্রী হত্যা করে মগধে শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

নন্দ বংশ ।। শিশুনাগের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কালাশোক বা কাকবর্ণ মগধের রাজা হন। মহাপদ্ম নন্দ নামে এক ব্যক্তি কাকবর্ণকে হত্যা করে মগধে নন্দ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপদ্মের আট পুত্র ছিল। নন্দবংশের শেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। তাঁর সময়ে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করেন। ধননন্দ গ্রীক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ধননন্দকে হত্যা করে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মৌর্য বংশ ঃ চন্দ্রগুপ্ত ।। চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরার নাম থেকে তাঁর রাজ বংশের নাম হয় মৌর্য বংশ। আবার কারও মতে তিনি মৌরীয় রাজ বংশের বংশধর বলে তাঁর রাজবংশের এই নাম হয়।

চন্দ্রগুপ্ত তক্ষশীলা নিবাসী চাণক্য নামে এক জ্ঞানী ও সুচতুর ব্রাহ্মণের সহায়তায় মগধের সিংহাসন লাভ করেন। সিংহাসন লাভের পর চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ অধিকার করেন। তিনি আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকসকে পরাজিত করেন। সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে এক গ্রীক দূতকে পাঠিয়েছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল বিশাল। তিনি সুশাসক ছিলেন। ফলে তাঁর সাম্রাজ্য শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। তিনি জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার মগধের রাজা হন। তিনি শান্তিপ্রিয় রাজা ছিলেন।

অশোক ।। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক মগধের সিংহাসন লাভ করেন। তের বছর রাজত্ব করার পরে তিনি কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। কলিঙ্গের সঙ্গে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। একলক্ষেরও বেশী লোক এই যুদ্ধে মারা যায়। এত মৃত্যু দেখে তিনি খুবই অনুতপ্ত হন। অনুতপ্ত সম্রাট বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিলেন। সাম্রাজ্যবাদী চণ্ডাশোক করুণাময় ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হন। তিনি যুদ্ধনীতি একেবারে ত্যাগ করেন।

যুদ্ধ জয় নয়, সকল প্রজার হৃদয় জয়ই হল তাঁর মূল নীতি। তিনি সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ প্রচারে মন দেন। তিনি বললেন, "সকল প্রজাই আমার সন্তান। প্রজাদের কাছে আমার অনেক ঋণ। সেই ঋণ শোধ করার জন্যই আমি রাজা হয়েছি।" পৃথিবীর অন্য কোন রাজাকে এমন কথা বলতে শোনা যায় নি। এখানেই অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব। তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শকে প্রচারের জন্য অশোক কয়েক শ্রেণীর রাজ-কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁরা হলেন ধর্মমহামাত্র, রাজুক, ধর্মযূত ইত্যাদি। তিনি নিজেও ধর্মযাত্রায় বের হতেন এবং ধর্মস্থানগুলি দর্শন করতেন। ভারতের বাইরেও তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। নিজে বৌদ্ধ হলেও অশোক অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন।



অশোক

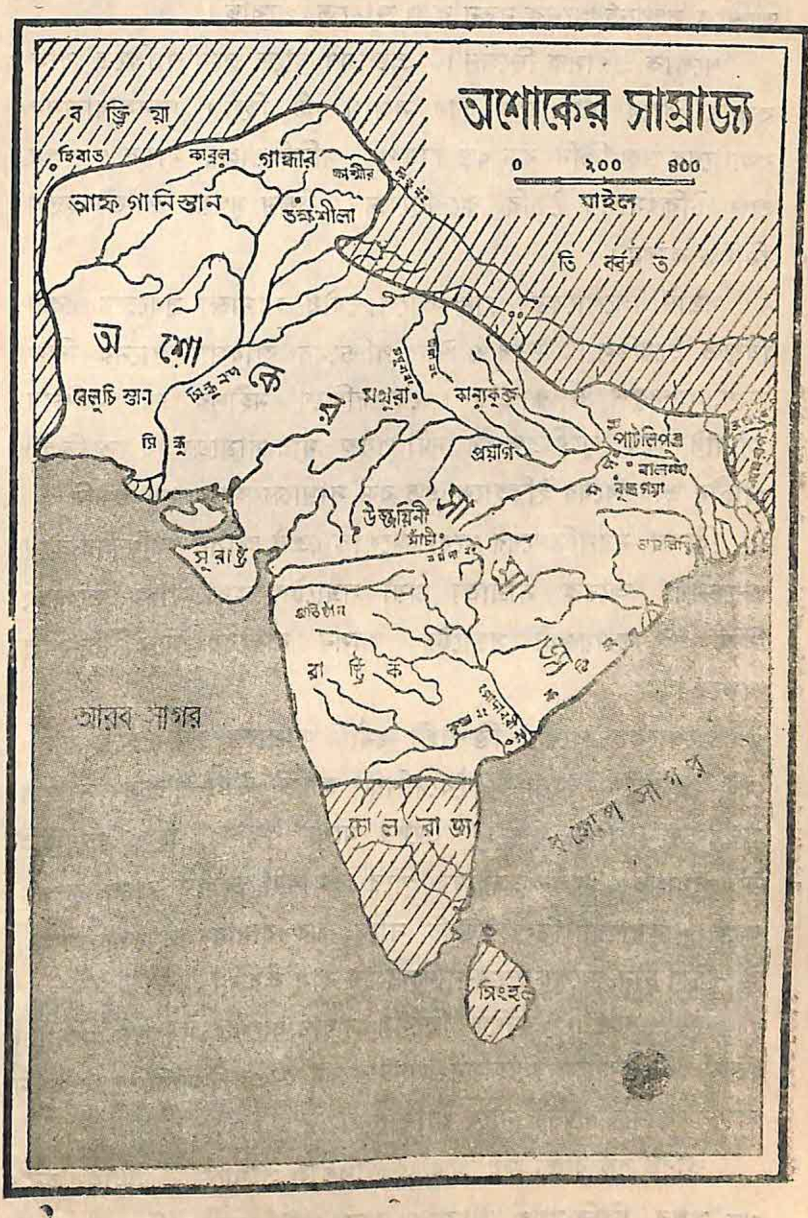
তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ের গায়ে বা পাথরের স্তম্ভে বৌদ্ধ ধর্মের বাণী সহজ ভাষায় খোদাই করার ব্যবস্থা করেন।



ব্রাহ্মীলিপি

অশোকের সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে যে সব লিখিত তথ্য পাওয়া যায় তা ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা। ব্রাহ্মী

লিপি হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন লিপি যার পাঠোদ্ধার করা



সম্ভব হয়েছে। জেমস প্রিন্সেপ নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ১৮৩৭

খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার করেন। তার ফলে আমরা অশোক সম্পর্কে অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছি।

অশোক সুশাসক ছিলেন। প্রজাগণ যাতে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে তার জন্য তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য তিনি বড় বড় রাজপথ, অতিথিশালা, মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় তৈরি করেছিলেন। তিনি মৃগয়া ও জীবহত্যা নিষিদ্ধ করেন।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে মৌর্য সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত হয়েছিল। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের আফগানিস্তানের কিছু অংশ, হিন্দুকুশ ও কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে মহীশূর এবং পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত বড় সাম্রাজ্য আর গড়ে ওঠেনি।

বিশ্বের নরপতিগণের মধ্যে অশোক শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছেন। অনেক সাম্রাজ্য জয়ী সম্রাটের কথা মানুষ ভুলেছে, কিন্তু এই হৃদয়জয়ী সম্রাটের আসন মানুষের মনে চিরকাল থাকবে।

অশোকের পরে শক্তিশালী মৌর্য সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে যায়। সেই সুযোগে কয়েকটি বৈদেশিক জাতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য স্থাপন করে। এদের মধ্যে কুষাণরা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। শক-পহ্লবদের পরে কুষাণরা ভারতে রাজ্য স্থাপন করে। কুষাণরা ছিল ইউ-চি নামে এক যাযাবর জাতির শাখা। ইউ-চিরা চীন দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে বাস করত।

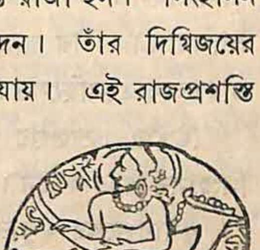
কুষাণ বংশ ॥ কণিষ্ক ছিলেন কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি ৭৮ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন ও একটি সংবতের প্রবর্তন করেন যা পরে শকাব্দ নামে খ্যাত হয়।

কণিষ্ক বহু রাজ্য জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। খুব সম্ভব তিনি মগধ আক্রমণ করে পাটলিপুত্র অধিকার করেন। ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়াতেও সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

কণিষ্ক দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন। কিন্তু দিগ্বিজয়ের জন্যই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত নন। শিল্প, সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি বিখ্যাত। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর। পুরুষপুরের কাছে তিনি একটি সুন্দর বৌদ্ধ মঠ তৈরি করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ মহাযান মতবাদ মধ্য এশিয়ায় প্রসার লাভ করে। তিনি শিল্প সাহিত্যেরও একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ যুগে গ্রীক, রোমান ও বৌদ্ধ শিল্পকলার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটে যা 'গন্ধার' শিল্প নামে খ্যাত। কণিষ্কের রাজসভায় বহু মনীষী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে 'বুদ্ধ চরিত' রচয়িতা অশ্বঘোষ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা চরক এবং বৈজ্ঞানিক নাগার্জুনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুপ্তবংশ ।। মৌর্য বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মগধের প্রাধান্য বিনষ্ট হয়। দীর্ঘকাল পরে গুপ্তযুগে আবার মগধের পুনরভ্যুদয় হয়। মগধ তার প্রাচীন গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পায়। গুপ্তবংশের প্রথম সার্বভৌম রাজা ছিলেন **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত**। তিনি ৩২০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলার উত্তরাংশ জয় করেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পরে তাঁর পুত্র **সমুদ্রগুপ্ত** রাজা হন। সিংহাসন লাভের পর সমুদ্রগুপ্ত রাজ্য বিস্তারে মন দেন। তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী হরিষেণের রাজপ্রশস্তি থেকে জানা যায়। এই রাজপ্রশস্তি এলাহাবাদের এক স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে। সমুদ্রগুপ্ত উত্তর-ভারতে নাগসেন, গণপতি নাগ, প্রভৃতি নয় জন রাজাকে পরাজিত করে তাদের রাজ্য নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। দক্ষিণ-ভারতে তিনি কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ প্রভৃতি কয়েক-জন রাজাকে পরাজিত করেন। এই রাজারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করায় তিনি তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন।



মুদ্রায় সমুদ্রগুপ্তের প্রতিকৃতি

সীমান্তবর্তী কয়েকটি রাজ্য তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে করদ রাজ্যে পরিণত হয়। উত্তর পশ্চিম ভারতের কুষাণ ও শকেরা এবং সিংহল তাঁর প্রাধান্য মেনে নেয়।

সমুদ্রগুপ্ত খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর অসাধারণ বিজয় অভিযানের জন্য তাঁকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলা হয়। তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি সুশাসক, বিদ্যোৎসাহী, কবি ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু এবং সভাকবি হরিষেণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত** আনুমানিক ৩৮০ খ্রীস্টাব্দে রাজা হন। তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি শকদের পরাজিত করেন এবং 'শকারি' বা শকবিজেতা নামে পরিচিত হন। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলতেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই খুব সম্ভবত কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্যের রাজসভা নবরত্নে ভূষিত ছিল। নবরত্নের অন্যতম ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাস। তাঁর রাজত্বকালে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র প্রথম **কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য** সিংহাসন লাভ করেন।

কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্যতম পুত্র **স্কন্দগুপ্ত** বাহুবলে সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর শাসনকালে মধ্য এশিয়ার শক্তিশালী হূণরা গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত তাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। বৈদেশিক আক্রমণের ভয় দূর হয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ॥ স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী সম্রাটেরা দুর্বল ছিলেন। হূণদের আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্যের ক্ষতি হয়েছিল। তার উপরে সামন্তরাজারা বিদ্রোহ করে এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য ভেঙ্গে ছোট ছোট রাজ্যের উৎপত্তি হয়। এভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটল।

গুপ্তযুগের পতনকাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস ॥ বৈদিক যুগে বাংলায় অনার্যদের বাসভূমি ছিল। মহাকাব্যের যুগে বাংলার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, মহাকাব্যের যুগে বাংলাতে আর্য প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে বাংলার উল্লেখ আছে। আলেকজাণ্ডারের সময়ের ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে জানা যায় যে, বাংলার রাজারা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ রোধ করার জন্য শক্তিশালী সৈন্যদল গড়ে তুলেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খুব সম্ভবত বাংলাকে তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনে এনেছিলেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুযায়ী বাংলা অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। উত্তরবঙ্গে পাওয়া মহাস্থান শিলালিপি থেকে জানা যায় বাংলা মৌর্যদের অধীন ছিল।

কুষাণ রাজারা বাংলায় তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন কিনা তা সঠিক ভারে জানা যায় না। গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে বাংলা তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে নি। সমুদ্রগুপ্ত বাংলাতে যে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন তা এলাহাবাদ প্রশস্তিতে আছে। গুপ্তশাসনের পতনের যুগে বাংলাতে দুটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে গড়ে ওঠে বঙ্গ। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গড়ে ওঠে গৌড়। বঙ্গ অঞ্চলের রাজাদের ছয়টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। তাতে তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদের। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে গৌড়ের শাসক শশাঙ্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সম্ভবত তিনি গুপ্তসম্রাটদেরই সামন্তরাজা ছিলেন। বাণভট্ট এবং হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে গৌড়ের অধিপতি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রাজধানী ছিন কর্ণসুবর্ণ। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটিই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ।

ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ॥ অতি

প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে ব্যাবিলন, সিরিয়া ও মিশরের নিবিড় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। নানারকমের মণিমুক্তা, মশলা এবং মসলিন ভারত থেকে রপ্তানি হত। বাণিজ্যিক সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। পণ্য সম্ভারের পিছু পিছু চলে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভাবধারা। পশ্চিম এশিয়ার দেশে দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। অপর পক্ষে রোম ও গ্রীসের জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং গ্রীক শিল্প ও মুদ্রা রীতির প্রভাব ভারতীয় জীবনে দেখা যায়।

মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে তাঁর ধর্ম প্রচারকেরা মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করে। কুষাণদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রসার ঘটে। স্যার অরেলস্টাইন-এর আবিষ্কার করা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, মধ্য এশিয়ার খোটান, কাশগড়, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ভারতীয় সমাজের প্রভাব মধ্য এশিয়ায় খুব বেশী রকম দেখা যায়। ফা-হিয়েন বলেছেন, মধ্য এশিয়ার কোন কোন রাজ্যে সাধারণ মানুষ ভারতীয় রীতি-নীতি মেনে চলত, কেবল তাদের ভাষাটাই ছিল আলাদা। ক্রমে চীনে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। বহু চীনা শ্রমণ ভারতে শিক্ষালাভ করতে এসেছিলেন, আবার বহু ভারতীয় পণ্ডিত চীন দেশে গিয়েছিলেন। চীনের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় ঔপনিবেশিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্মদেশে, কম্বুজ, চম্পা, সুমাত্রা, বলি, জাভা, এবং সিংহলের সঙ্গে গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত সমাজকে সুসভ্য করে তুলেছিল।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ ॥ মেগাস্থিনিস ছিলেন একজন গ্রীক রাষ্ট্রদূত। সিরিয়ার গ্রীক অধিপতি সেলুকস তাঁকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় পাঠান। তিনি মৌর্য ভারত সম্পর্কে বিবরণ লিখে গেছেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ নগর। নগরটি নয় মাইল লম্বা ও দুই মাইল চওড়া। রাজপ্রাসাদটি ছিল কাঠের তৈরি। রাজপ্রাসাদটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল।

মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রের সুনিয়ন্ত্রিত পৌর শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। রাজ্য শাসন ও সামরিক ব্যবস্থাও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

মেগাস্থিনিস ভারতীয় সমাজকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। (১) দার্শনিক—এরা সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণী। (২) কৃষক—এদের একমাত্র কাজ চাষবাস করা। (৩) পশুপালক—এরা ছিল যাযাবর। (৪) শিল্পী—এরা যুদ্ধের ও কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি তৈরি করত। (৫) সৈনিক—যুদ্ধই এদের একমাত্র পেশা। (৬) পরিদর্শক—এরা রাজ্যের সংবাদ সম্রাটের গোচরে আনত। (৭) অমাত্য—এরা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভারতীয়েরা সরল জীবন যাপন করত। তাদের নৈতিক চরিত্র ছিল খুবই উন্নত। দেশে চুরি ডাকাতি ছিল না। কৃষি ও পশুপালন জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা ছিল। শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ উন্নত ছিল।

ফা-হিয়েনের বিবরণ॥ চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। তখন গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল। ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতে ছিলেন। ফা-হিয়েন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিবরণ রেখে গেছেন।

তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা স্বচ্ছল ছিল। তিনি তাদের দানশীলতার খুব প্রশংসা করেছেন। উজ্জয়িনী ছিল অন্যতম এক সমৃদ্ধিশালী নগরী। গুপ্ত সম্রাটগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। পুরুষপুরে কণিষ্কের তৈরি একটি বৌদ্ধ

স্তূপের সৌন্দর্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করত।

প্রাচীন ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাধনা।। সিন্ধু সভ্যতার আমলে যে শিল্প চর্চার শুরু তা মৌর্য যুগে এক উন্নত অবস্থা লাভ করে। তার স্বাক্ষর হয়েছে অশোক স্তম্ভ, সারনাথ, মৌর্য রাজ-প্রাসাদ ও বৌদ্ধ স্তূপ প্রভৃতির গঠন ও কারুকার্যের মধ্যে। মৌর্য যুগের পরে গন্ধার শিল্প খ্যাতিলাভ করে। গন্ধার শিল্পের মধ্যে গ্রীক প্রভাব ছিল। এই সময়ে বুদ্ধদেবের মূর্তি গ্রীক দেবতা এ্যাপোলোর অনুকরণে তৈরি হয়। গুপ্তযুগে ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। সারনাথের বুদ্ধ মূর্তি, সাঁচী ও দেওগড়ের দশাবতারের মন্দির এ যুগের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অজন্তা গুহা মন্দিরের অভ্যন্তরে অঙ্কিত চিত্রাবলী এক কথায় অপূর্ব। এখানে বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে বহু অপরূপ চিত্র অঙ্কিত রয়েছে।


অজন্তার বুদ্ধ মূর্তি

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সম্পদ ভারতীয়দের গর্বের বস্তু। মৌর্যযুগে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' রচিত হয়েছিল। কণিষ্কের আমলে কবি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত-শাসনকাল সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ। কালিদাস রচিত 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত' প্রভৃতি নাটকগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রেও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। সর্বকালের দুই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আর্যভট্ট এবং বরাহমিহির গুপ্তযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের প্রতিভায় জ্যোতিষ ও গণিত বিদ্যার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। আর্যভট্টই প্রথম

আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সূর্যের চার দিকে ঘোরে। তিনি শূন্য ও দশমিকের সাহায্যে গণনা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঁচটি শাখার আলোচনা আছে। কণিষ্কের সময়ে চরক আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। গুপ্তযুগে শুশ্রুতের শলাবিদ্যা খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল।

বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান ছিল ভারতবর্ষ। সেই প্রাচীনকালেই শিক্ষাদানের জন্য ভারতে অনেক শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাক্ষেত্রগুলির মধ্যে তক্ষশীলা হচ্ছে প্রাচীনতম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশদেশান্তরের বহু ছাত্র এখানে বিদ্যালাভ করতে আসত। চিকিৎসাবিদ্যা, রাজনীতি, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ও ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ে এখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। সমর শাস্ত্র ও নানারকমের শিল্পকলা শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। বৈয়াকরণ পাণিনি, অর্থশাস্ত্র প্রণেতা কৌটিল্য ও বুদ্ধের চিকিৎসক জীবক তক্ষশীলায় শিক্ষালাভ করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার মান খুব উন্নত ছিল। ছাত্রদের জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা সেদিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হত। জীবকের একটি কাহিনী থেকে আমরা এ বিষয়টি জানতে পারি। জীবক সাত বছর ধরে তক্ষশীলায় বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন। শিক্ষার শেষে তাঁর শিক্ষাগুরু তাঁকে তক্ষশীলার চারদিকে ঘুরে এমন সব গাছ-গাছড়া নিয়ে আসতে বললেন যেগুলি ওষুধ তৈরির কাজে লাগে না। জীবক ফিরে এসে জানালেন, এমন কোন গাছ-গাছড়ার সন্ধান তিনি পেলেন না। শিক্ষাগুরু খুব খুশী হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, জীবকের সম্যক জ্ঞানলাভ হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের আর একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল নালন্দা

বিশ্ববিদ্যালয়। নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দূরদেশ থেকে ছাত্রেরা এখানে অধ্যয়ন করতে আসত। পড়াশোনা ও থাকা খাওয়ার জন্য তাদের কোন খরচ লাগত না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সহজ ছিল না। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্রদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হত। তবেই তারা ভর্তি হতে পারত। শিক্ষকেরা প্রত্যেকেই ছিলেন মহাপণ্ডিত। তাঁরা নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদান করতেন। ছাত্রেরা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষালাভ করত। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র, বেদ, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি বহু বিষয়ে এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। পরবর্তীকালে সম্রাট হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি আরও বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের পীঠস্থানরূপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

অনুশীলনী

লোহার যুগের বৈশিষ্ট্য

১। লোহা আবিষ্কার ও তার ব্যবহার সম্পর্কে কি জান?

২। লোহার ব্যাপক ব্যবহার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কি পরিবর্তন আনে?

৩। লোহার যুগে শাসনব্যবস্থায় কি পরিবর্তন দেখা যায়?

ব্যাবিলন সভ্যতা

১। ব্যাবিলনের সমৃদ্ধির কারণগুলি কি কি?

২। ব্যাবিলনের ব্যবসা-বাণিজ্য কেমনভাবে চলত?

৩। পুরোহিতদের কি রকম প্রতিপত্তি ছিল?

৪। হাম্মুরাবি কে ছিলেন? তাঁর আইন-সংহিতা থেকে ব্যাবিলনের সমাজ জীবনের কি পরিচয় আমরা পাই?

মিশর

১। মিশরে নতুন যুগের রাজত্বের সূচনা করেন কোন ফেরায়ো? কেমন করেই বা করেন?

২। প্রথম থুথমিসের রাজ্য জয় সম্পর্কে কি জান ?

৩। কোন ফেরায়ো মিশরের সাম্রাজ্য সীমা সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত করেন ? তাঁর সময়ে মিশর সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ?

৪। এই যুগে মিশরের পুরোহিতদের ক্ষমতা কিরূপ ছিল ?

৫। ইখানিটন নাম গ্রহণ করেছিলেন কোন ফেরায়ো ? তিনি কেন এই নাম গ্রহণ করেছিলেন ?

ইরান

১। **বাঁদিকের স্তম্ভের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভ মিলিয়ে দাও ঃ**

মেড ও পারসিক	দারায়ুস
ক্যামবাইসিজ	আবেস্তা
ইরাণীদের ধর্মগ্রন্থ	মিশর জয়
বেহিস্তান লিপি	ইরাণীদের দুই শাখা

২। কিভাবে সাইরাস্ পারস্য সাম্রাজ্যের সূচনা ও বিস্তার করেন ?

৩। দারায়ুসের রাজ্য জয় সম্পর্কে কি জান ?

৪। দারায়ুসের রাজ্য শাসন পদ্ধতি কেমন ছিল ?

৫। জরথুস্ট্র কে ছিলেন ? তাঁর ধর্মের মূল কথাগুলি কি কি ?

ইহুদী জাতি

১। মিশরের হিব্রুদের অবস্থা কেমন ছিল ? ফেরায়ো তাদের উপর কি কি ধরনের অত্যাচার করতেন ?

২। দাসত্ব থেকে হিব্রুদের মুক্তি ঘটেছিল কিভাবে ?

৩। হিব্রুদের একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করার কৃতিত্ব কার ?

গ্রীস

১। **দুই এক কথায় উত্তর দাও ঃ—**

(ক) হোমারের মহাকাব্য দুখানির নাম কি কি ?

(খ) ইতিহাসের জনক বলা হয় কাকে ?

(গ) কোন বিখ্যাত দার্শনিক আলেকজাণ্ডারের গৃহশিক্ষক ছিলেন ?

(ঘ) কোন গ্রীক সেনাপতি আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনী নিয়ে সমুদ্রপথে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ?

২। **বাঁদিকের স্তম্ভের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভ মিলিয়ে দাও ঃ—**

মিনোয়ান সভ্যতা	স্পার্টার দাস
এথেন্স ও স্পার্টা	এথেনা
হেলট	ফিডিয়াস
স্থপতি	ক্রীট
ইউরিপাইডিস	ইকটিনাস
জ্ঞানের দেবী	দুই প্রধান নগর রাষ্ট্র
সূর্যের দেবতা	নাট্যকার
বিখ্যাত ভাস্কর	এ্যাপোলো

৩। ক্রীটের সভ্যতা সম্পর্কে কি জান? এই সভ্যতা গ্রীসকে কিভাবে প্রভাবিত করে?

৪। হোমারের মহাকাব্য থেকে প্রাচীন গ্রীকদের সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি?

৫। গ্রীসে নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল কেন? তাদের সম্পর্কে কি জান?

৬। (ক) এথেন্সের লোকেদের ছোটবেলা থেকে কি কি শিক্ষা দেওয়া হত? এথেন্সের শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল?

(খ) স্পার্টার সমাজ জীবন কেমন ছিল?

৭। সফোক্লিস ও সক্রেটিস সম্পর্কে কি জান?

৮। এথেন্স ও স্পার্টার দ্বন্দ্বের কারণ কি ছিল? এই যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল? কোন ঐতিহাসিকের বিবরণ থেকে আমরা এই যুদ্ধের কাহিনী জানতে পারি?

৯। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান সম্পর্কে কি জান? তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সাম্রাজ্যের কি পরিণতি হয়?

১০। কেমন করে গ্রীসের পতন হয়?

রোম

১। রোমনগরী প্রতিষ্ঠার কাহিনী সম্পর্কে কি জান?

২। প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান কাদের বলা হত? তাদের সম্পর্কে তুমি কি জান?

৩। রোমান সমাজে দাসদের অবস্থা কেমন ছিল? এম্ফিথিয়েটার কাকে বলে? সেখানে কি অনুষ্ঠান হত?

৪। স্পার্টকাস কে ছিলেন? তাঁর নেতৃত্বে দাস বিদ্রোহ সম্পর্কে কি জান?

৫। রোমের সঙ্গে কার্থেজের যুদ্ধের কারণ কি ছিল? এই যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল?

৬। হ্যানিবল কে ছিলেন? তাঁর বীরত্ব কাহিনী সম্পর্কে কি জান?

৭। রোমে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কিভাবে একনায়কতন্ত্রে পরিণত হয়? সবচেয়ে প্রসিদ্ধ একনায়ক কে? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

৮। কিভাবে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল?

৯। যীশু কে ছিলেন? তাঁকে খ্রীষ্ট কেন বলা হয়? তাঁর উপদেশগুলি কি? খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ কি?

চীন

১। চীনের শাং রাজবংশ সম্পর্কে কি জান?

২। কনফুসিয়াস কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন? তিনি মাতৃভূমির কি অবস্থা দেখেন? দেশে ভাল অবস্থা আনার জন্য তিনি কি করেছিলেন?

৩। কনফুসিয়াস কি শিক্ষা দিতেন? কেমন করে দিতেন? তাঁর উপদেশগুলি সম্পর্কে কি জান?

৪। চিন্ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে? কেন তাঁকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়?

। চীনে বিশাল প্রাচীর কোন সময়ে তৈরি শুরু হয়? প্রাচীরটি কেন তৈরি করা হয়?

ভারত

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—**

(ক) আর্যরা কোথা থেকে কখন ভারতে আসে?

(খ) রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করেন কে কে?

(গ) চতুর্যাম কি?

(ঘ) আর্যসত্য কে ব্যাখ্যা করেন? আর্যসত্য কি কি?

(ঙ) মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? কোন গ্রীকদূত তাঁর রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন?

(চ) কোন যুদ্ধ অশোকের মনের পরিবর্তন আনে? তারপর তিনি কি করবেন স্থির করেছিলেন?

(ছ) এলাহাবাদের স্তম্ভগাত্রের প্রশস্তি কার রচনা? কোন রাজার কৃতিত্ব এখানে বর্ণিত আছে?

২। **বাঁদিকের স্তম্ভের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভ ঠিকমত মিলিয়ে দাও ঃ**

ত্রিপিটক	বুদ্ধচরিত
চন্দ্রগুপ্ত	ভারতের নেপোলিয়ন
কৌটিল্য	প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ
সমুদ্রগুপ্ত	সেলুকস
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত	বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ
অশ্বঘোষ	মেঘদূত
আর্যভট্ট	অর্থশাস্ত্র
কালিদাস	বিশ্ববিদ্যালয়
নালন্দা	ফা-হিয়েন

৩। বৈদিক যুগে সমাজ জীবন কেমন ছিল ?

৪। বেদ কি ? কয় ভাগে বিভক্ত।

৫। জৈন ধর্মের মূল কথা কি ?

৬। গৌতম বুদ্ধ কে ছিলেন ? তাঁর ধর্মের মূল কথা কি কি ?

৭। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ? তাঁর সম্পর্কে কি জান ?

৮। কণিষ্ক কে ছিলেন ? তাঁর রাজত্বকাল স্মরণীয় কেন ?

৯। গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ? তাঁর রাজ্য জয় সম্পর্কে কি জান ?

১০। মেগাস্থিনিস কে ছিলেন ? তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী, ভারতবাসী ও তাঁদের জীবিকা সম্পর্কে কি কি কথা বলেছেন ?

১১। ফা-হিয়েন কে ছিলেন ? তিনি কখন ভারতবর্ষে আসেন ? ভারতবাসী সম্পর্কে তিনি কি মত প্রকাশ করেছেন ?

১২। প্রাচীন ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাধনা সম্পর্কে কি জান ?

১৩। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে কি জান ?

১৪। কোন কোন প্রতিবেশী দেশে ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল ?

১৫। তক্ষশীলা ও নালন্দার প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে কি জান ?

প্রশ্নাবলী

[পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশ্নপত্রের নতুন ধারার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত করানোর জন্য অনুশীলনী আরও বিস্তৃত ও দীর্ঘ করা হল। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন, বিষয়মুখী প্রশ্ন ইত্যাদি এখানে সন্নিবেশিত হল। **প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেও রচনাত্মক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন এবং বিষয়মুখী প্রশ্ন অনেক স্থান পেয়েছে।** এর সঙ্গে সেগুলি অনুশীলন করলে ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট উপকৃত হবে।]

প্রথম অধ্যায়

১। **দুই-এক কথায় উত্তর দাও :—**

(ক) ইতিহাসের বিষয়বস্তু কি ?

(খ) ইতিহাসের উপাদান বলতে কি বোঝ ?

(গ) প্রাচীন যুগে মিশরীয়রা কিসের উপরে লিখত ?

(ঘ) প্রাচীন ভারতে লেখা হত কিসের উপরে ?

(ঙ) ইলিয়াড ও ওডেসি কার রচনা ? তিনি কোন দেশের লোক ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—**

(ক) প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানগুলি কি কি ?

(খ) 'উৎকীর্ণ লিপি' বলতে কি বোঝ ?

(গ) মিশরীয়রা পেপিরাস তৈরি করত কেমন করে ?

(ঘ) ব্যাবিলনের লোকেরা কেমন ভাবে লিখত ?

(ঙ) প্রাচীন মুদ্রা ইতিহাস জানতে আমাদের কেমনভাবে সাহায্য করে ?

(চ) আমাদের দেশের কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থের নাম কর। সেগুলি থেকে আমরা কি জানতে পারি ?

(ছ) "রোম দেশের মুদ্রা ভারতের কোথাও কোথাও পাওয়া গেছে।" —এই উক্তি থেকে কি জানা যায় ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। **দুই-এক কথায় উত্তর দাও :—**

(ক) মানুষের জীবনে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কোনটি ?

(খ) 'পিকিং-মানুষ' বলতে কি বোঝায় ?

(গ) হাতিয়ার মানুষকে কিভাবে সাহায্য করে ?

(ঘ) সবচেয়ে প্রথম হাতিয়ার কোনটি ?

(ঙ) নতুন পাথরের যুগের হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য কি ?

(চ) চাষবাস শুরু হয় কখন ?

(ছ) মাল বইবার কাজে পশুকে লাগানো হল কেন ?

(জ) আলতামিরা কি ? কোন দেশে অবস্থিত ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—**

(ক) প্রাচীন যুগের মানুষ কিভাবে খাবারের সংস্থান করত ?

(খ) শিকারের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন এল ?

(গ) চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কি ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার শিখল ? সেগুলি কোন্ কোন্ কাজে ব্যবহৃত হত ?

(ঘ) মানুষের প্রথম পোষা জন্তু কোনটি ? মানুষ পশুপালন করতে লাগল কেন ?

(ঙ) মানুষ ঘরবাড়ী বাঁধল কেন ?

(চ) ট্রাইব বা উপজাতি গড়ে উঠল কিভাবে ?

(ছ) মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে ও কেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হল ?

(জ) আলতামিরা গুহায় কি পাওয়া গেছে ? তা থেকে সে সময়কার মানুষ সম্পর্কে কি জানা যায় ?

(ঝ) মানুষ প্রথমদিকে কিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করত ? কথা বলতে শিখে মানুষের কি সুবিধা হল ?

(ঞ) "অদৃশ্য শক্তিকে খুশী করার মধ্য দিয়েই দেবপূজার প্রচলন হল"— এই উক্তির সমর্থনে কি বলতে পার ?

তৃতীয় অধ্যায়

১। **দুই-এক কথায় উত্তর দাও :—**

(ক) তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য কি ?

(খ) দাস বলতে কাদের বোঝায় ?

(গ) রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠল কেন ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—**

(ক) কারিগরী দক্ষতা কেমনভাবে মানুষকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে ?

(খ) ধনী পরিবার ও গরীব পরিবার সৃষ্টি হল কিভাবে ?

(গ) নদীর তীরে প্রাচীন সভ্যতা বিকাশের তিনটি কারণ বলতে পার কি ?

৩। বিষয়মুখী প্রশ্ন :—সঠিক উত্তরের পাশে '√' চিহ্ন দাও :

(ক) ব্রোঞ্জ — রূপা ও সীসার মিশ্রণে তৈরি / টিন ও রূপার মিশ্রণে তৈরি / টিন ও তামার মিশ্রণে তৈরি

(খ) ছুতোর — মাটির কাজ করে / কাপড় বোনে / কাঠের কাজ করে

(গ) হোয়াংহো একটি — দেশ / নদী / শহর

৪। বামদিকের স্তম্ভের সঙ্গে ডান দিকের স্তম্ভ মিলিয়ে দাও :—

(ক) টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস	(ক) নীলনদ
(খ) চীন	(খ) পশ্চিম এশিয়া
(গ) সিন্ধুনদ	(গ) হোয়াংহো
(ঘ) মিশর	(ঘ) ভারত

চতুর্থ অধ্যায়

মেসোপটেমিয়া

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন :—সঠিক উত্তরের পাশে '√' চিহ্ন দাও :

(ক) মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম — ইংল্যাণ্ড / ইরান / ইরাক

(খ) প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা বলতে বুঝি — সুমের সভ্যতা / সিন্ধু সভ্যতা / ব্যাবিলন সভ্যতা

(গ) কিউনিফর্ম বলতে কি বুঝি — মিশরীয় লিপি / সুমেরীয় লিপি / সিন্ধু লিপি

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) সুমের সভ্যতার পরিচয় জানা গেছে কিভাবে ?

(খ) সুমেরবাসীরা বন্যার জল কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল ?

(গ) সুমেরে মজুর ও কারিগরদের অবস্থা কেমন ছিল ?

(ঘ) চিত্রলিপি বলতে কি বোঝ ?

মিশর

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**—সঠিক উত্তরের পাশে '√' চিহ্ন দাও ঃ

(ক) মিশর কোন মহাদেশে অবস্থিত { এশিয়া / ইউরোপ / আফ্রিকা

(খ) কোন নদীর জন্য মিশর সভ্যতার পীঠভূমি হয়েছে { টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস / হোয়াংহো / নীলনদ

(গ) মিশরীয় লিপিকে বলা হয় { হায়ারোগ্লিফিক / কিউনিফর্ম / ব্রাহ্মী

২। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**—

(ক) মিশরের রাজাকে বলা হত———।

(খ) রাজা কুফুর পিরামিড ——— ——— নামে খ্যাত।

(গ) ওসাইরিস ছিলেন ——— ———।

(ঘ) মিশরীয় লিপি ছিল ———। একটি ——— শব্দের জন্য ব্যবহৃত হত। জল বোঝাবার জন্য তারা ——— এর ছবি আঁকত।

৩। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ**—

(ক) মিশরে শিক্ষার দায়িত্ব পালন করত কারা? বিদ্যালয় কোথায় ছিল?

(খ) ফেরায়োর শক্তিবৃদ্ধিতে পুরোহিতদের কি ভূমিকা ছিল?

(গ) কর আদায়কারীকে কি কি কাজ করতে হত?

(ঘ) "যারা চাষী ও মজুর, তারাই সৈন্য"—এই উক্তির সমর্থনে তুমি কি বলতে পার?

(ঙ) সামপোলিয়ঁ কোন দেশের লোক? তিনি কোন লিপির পাঠোদ্ধার করেন?

(চ) ম্যমি কাকে বলে? মিশরীয়রা কেমনভাবে শবদেহ কবরে রাখত?

(ছ) মিশরে চাষী ও দাসের জীবন কেমন ছিল?

(জ) মিশরীয় কারিগরদের দক্ষতা কেমন ছিল? তাদের অবস্থা কেমন ছিল?

সিন্ধু উপত্যকা

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর:**

(ক) হরপ্পাতে খননের কাজ আরম্ভ করেন ————।

(খ) ———— মহেঞ্জোদারোতে খননের কাজ আরম্ভ করেন।

(গ) ———— বড় শস্যভাণ্ডার পাওয়া গেছে।

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:—**

(ক) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে জল নিকাশের কি ব্যবস্থা ছিল?

(খ) নগর দুটির সুরক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল?

(গ) সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের খাদ্য কি ছিল?

(ঘ) সিন্ধু উপত্যকার অভিজাত শ্রেণীর ও কারিগরদের অবস্থা কেমন ছিল?

(ঙ) সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটে কিভাবে?

নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতা

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:**

(ক) নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতা বলতে কোন্ কোন্ সভ্যতা বোঝ?

(খ) ছক কেটে নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাও।

পঞ্চম অধ্যায়

লোহার যুগ

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:**

(ক) লোহার আবিষ্কার হয় কখন? লোহার আবিষ্কার করে কারা?

(খ) ধাতু হিসেবে লোহার তিনটি বিশেষ গুণ কি কি?

(গ) উৎপাদন, যানবাহন ও যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে লোহা কি পরিবর্তন আনে?

ব্যাবিলন

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:**

(ক) "ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ব্যাবিলনের জীবন"—এই উক্তির যথার্থতা কি?

(খ) ব্যবসা-বাণিজ্যে লেনদেন চলত কেমনভাবে? এই সম্পর্কে তথ্য জানা গেছে কিভাবে?

(গ) ব্যাবিলনে পুরোহিতরা কি কি কাজ করত?

(ঘ) লেখাপড়ার কি ব্যবস্থা ছিল?

(ঙ) ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা কে? তিনি বিখ্যাত কেন?

২। **উত্তর দাও ঃ**

(ক) আইন সংহিতা থেকে সাধারণ প্রজার অবস্থা সম্পর্কে কি জানা যায় ?

(খ) আইন সংহিতায় দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারকের কি শাস্তি ছিল ?

(গ) স্ত্রীলোকের অবস্থা কেমন ছিল ?

৩। **বামদিকের স্তম্ভের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভ মিলিয়ে দাও ঃ**

(ক) মারডুক	(ক) আইন সংহিতা
(খ) এন্‌লিল	(খ) বায়ু দেবতা
(গ) ইশ্‌তার	(গ) ব্যাবিলনের নগর দেবতা
(ঘ) আ	(ঘ) পৃথিবীর দেবতা
(ঙ) হাম্মুরাবি	(ঙ) যুদ্ধের দেবতা

মিশর

১। **দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) হিক্‌সস্ কারা ? তারা কোথায় থাকত ? মিশরে এল কিভাবে ?

(খ) কোন্ ফেরায়ো হিক্‌সস্‌দের মিশর থেকে বিতাড়িত করেন ?

(গ) সম্রাট তৃতীয় থুথমিসের রাজ্য জয়ের কাহিনী কেমন করে জানা গেছে ?

(ঘ) দেবতা আমন-এর মন্দির কোথায় ? সেই মন্দির সম্পর্কে কি জান ?

ইরান

১। **দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) দারায়ুসের দিগ্বিজয়ের কাহিনী কেমন করে জানা গেছে ?

(খ) দারায়ুসের মুদ্রা সংস্কারের ফল কি হয়েছিল ?

(গ) ম্যারাথনের যুদ্ধ কাদের মধ্যে সঙ্ঘটিত হয় ?

(ঘ) ইরানীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি ? কার উপদেশ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ?

ইহুদীদের কথা

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ**

(ক) হিব্রু বলতে কাদের বোঝায় ? কেন 'হিব্রু' কথাটি ব্যবহৃত হত ?

(খ) হিব্রুদের শাস্তি দিয়েছিলেন কোন্ ফেরায়ো ? তিনি কেন শাস্তি দেন ?

(গ) মোজেস কে ছিলেন ? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

(ঘ) মোজেসের মৃত্যুর পরে হিব্রুরা কোথায় নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে ?

গ্রীস

১। বামদিকের স্তম্ভের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভ মিলিয়ে দাও :

(ক) পার্থেনন	(ক) পুরু
(খ) আকাশ বজ্র ও বিদ্যুতের দেবতা	(খ) জ্ঞানের দেবী
(গ) এথেনা	(গ) সূর্যের দেবতা
(ঘ) এ্যাপোলো	(ঘ) জিউস
(ঙ) আলেকজাণ্ডার	(ঙ) দেবী এথেনার মন্দির

২। দুই-এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ক্রীটের রাজধানী কোথায় ছিল ? ক্রীটের সভ্যতার নাম কি ?

(খ) হোমারের মহাকাব্য দুখানির নাম কি ?

(গ) গ্রীসের দুই প্রধান নগররাষ্ট্র কি কি ?

(ঘ) গ্রীসের দুজন বিখ্যাত নাট্যকার ও দুজন বিখ্যাত দার্শনিকের নাম বলতে পার ?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) গ্রীক উপনিবেশ সম্পর্কে তুমি কি জান ?

(খ) স্পার্টার সামরিক শিক্ষা পদ্ধতি কেমন ছিল ?

(গ) হেলট বলতে কাদের বোঝায় ? তাদের অবস্থা কেমন ছিল ?

(ঘ) পেরিক্লিসের যুগ বলতে কি বোঝ ? পেরিক্লিসের কৃতিত্ব কোথায় ?

(ঙ) সক্রেটিস সম্পর্কে তুমি কি জান ?

(চ) পেলোপনেসীয় যুদ্ধ বাধে কাদের মধ্যে ? এই যুদ্ধ কখন শুরু হয়, কত বছর ধরে চলে ?

(ছ) হেরোডোটাস কে ? তাঁর নাম স্মরণীয় কেন ?

রোম

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) কলোসিয়াম কি ? সেখানে কি ধরনের অনুষ্ঠান হত ?

(খ) স্পার্টাকাসের আগে দাসবিদ্রোহের নেতা কারা ?

(গ) পিউনিক যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয় ? পিউনিক বলতে কি বোঝ ?

(ঘ) সিপিও কে ? কোন যুদ্ধে তিনি হ্যানিবলকে পরাজিত করেন ?

(ঙ) খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক কে ? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থের নাম কি ?

(চ) জুলিয়াস সীজারের রাজ্যজয় সম্পর্কে কি জান ?

(ছ) রোমসাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ?

চীন

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) চীনের ইতিহাসে চৌরাজবংশের গুরুত্ব কি ?

(খ) কনফুসিয়াস কোথায়, কখন জন্মগ্রহণ করেন ?

(গ) চীনের প্রাচীর তৈরির কাজে কতলোক নিযুক্ত হয়েছিল ? প্রাচীরটা কতটা দীর্ঘ, চওড়াই বা কতটা ?

ভারত

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) বেদ কথাটির অর্থ ———।

(খ) বেদের অপর নাম ———।

(গ) আর্য সমাজের মূল কেন্দ্র ছিল ———।

(ঘ) সকল বন্ধন ও আসক্তি থেকে মুক্তিলাভ করাকে জৈনরা বলে ———।

(ঙ) বুদ্ধদেবের তিরোধান বৌদ্ধশাস্ত্রে ——— নামে খ্যাত।

(চ) চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় ——— নামে এক গ্রীক দূত উপস্থিত ছিলেন।

(ছ) ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার করেন ———।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) আর্যসমাজে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল ?

(খ) বৈদিক যুগে বিভিন্ন বর্ণের বৃত্তি কি ছিল ?

(গ) রামায়ণ ও মহাভারত থেকে কি জানা যায় ?

(ঘ) 'শকারি' বলা হয় কাকে ? কেন বলা হয় ?

(ঙ) বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা কে ? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল ?

(চ) মেগাস্থিনিস ভারতীয় সমাজকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ? কি কি ?

(ছ) মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে ভারতীয়দের জীবন সম্পর্কে কি জানা যায় ?

(জ) প্রাচীন ভারতে শিল্পে উৎকর্ষের কি প্রমাণ দিতে পার ?

(ঝ) প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান সাধনার কি কি তথ্য জানা যায় ?

(ঞ) তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন রীতি কেমন ছিল ?

(ট) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য কি রকম ব্যবস্থা ছিল ?

(ঠ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পর্কে কি তথ্য জানা যায় ?

———